পরিবেশ | পরিকাঠামো | পর্যটন | জঙ্গল | জনসত্ত্বা | শিক্ষা | স্বাস্থ্য | সাহিত্য | সংস্কৃতি

এখন ডুয়ার্স

নভেম্বর ২০১৪। মূল্য ১২ টাকা

ডুয়ার্সে হাতি বিপন্ন নাকি বিপর্যয় ?

জঙ্গি অভয়ারণ্যে ডুয়ার্স করিডর

এখন ডুয়ার্স

জঙ্গি অভয়ারণ্যে নিরিবিলি করিডর ডুয়ার্স ৬

ডুয়ার্সে হাতি আজ বিপন্ন! নাকি বিপর্যয়! ১০

ডুয়ার্সের পর্যটন আজ বড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি ১৪

কোচবিহারের রাসমেলা ১৮

চোরাশিকারির প্রত্যাবর্তন ২৪

বক্সা-লেপচা খা ২৬

ছোটগল্প বারবাঁক ২৮

জলপাইগুড়ির নাট্যচর্চা ৩১

পাঠকের কলম ৩৪

প্রচ্ছদ ছবিটি তুলেছেন বিশ্বপ্রিয় রাহুত

সম্পাদনা

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

নিখিলেশ রায়চৌধুরী

অমিত কুমার দে

প্রকাশনা

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

কলকাতা দপ্তর

এই অবকাশে, ১৮/৭ ডোভার লেন,

কলকাতা ৭০০ ০২৯

মুদ্রণ

অ্যালবাট্রস

ইমেল ekhonduars@yahoo.com

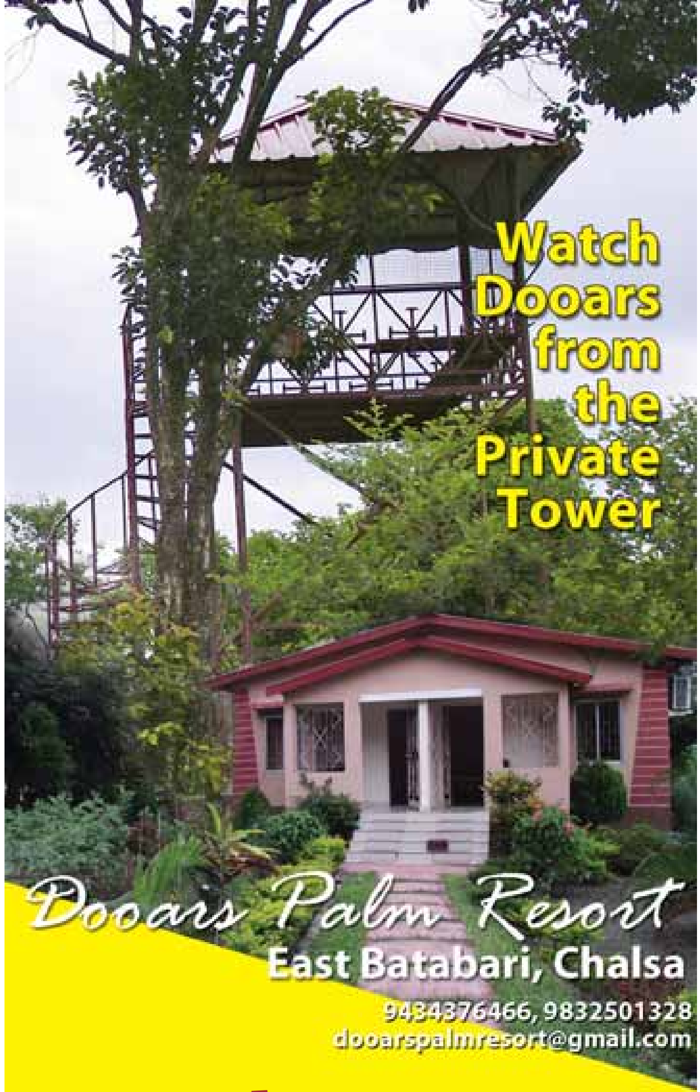

Package Tour

Hotel Booking

Car Rental

Specialist in Sikkim, Darjeeling, Dooars, Bhutan

Wild Leaf

Wild Leaf Holidays

Contact Bumba - 94343 19850, 97330 12921, 03562 260329

mail : info.wildleaf@gmail.com

Opposite Gas Godown, Chalsa, Jalpaiguri

অপ্রস্তুত !

কথায় বলে, ডাকাতেরা যে মহল্লায় বসবাস করে সেই তল্লাটে চুরি-ডাকাতি হয় না। গত দু-তিন দশক ধরেই আমরা শুনতে পাই আমাদের রাজ্য হল শান্তির পীঠস্থান, এখানে অন্য রাজ্যের মতো কথায় কথায় দুর্বৃত্তের বোমাবাজি, জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সন্ত্রাস ইত্যাদি হয় না। যে টুকু হয় তাও 'রাজনৈতিক' সংঘর্ষ। সমালোচকরা অবশ্য এ কথা শুনলেই বলে উঠতেন সেই এক কথা, যে এলাকায় জঙ্গিদের নিজেদের ডেরা সেখানে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই তো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব 'শান্তি' তো সেখানে বলবৎ থাকবে আলবাৎ। কিন্তু মাঝে মধ্যে দুর্ঘটনাক্রমে সেখানেই যখন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যায় তখন সেখানকার 'শান্তিপ্রিয়' কোটালদের ঘুম উড়ে যায়। একে তো অশান্তি মোকাবিলার 'অভ্যাস' নষ্ট হয়ে গেছে, তার ওপর যদি 'প্রশ্নচিহ্ন' দেশের নিরাপত্তা নিয়ে হয় তবে তো তা আরও মারাত্মক। 'পলিটিকাল কেস' হলে অত মাথাব্যথা থাকত না, স্রেফ রুলিং পার্টির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললেই ঝামেলা মিটে যায়। মিডিয়াকে নিয়েও এত টেনশন হয় না, দুদিন 'ঘ্যানঘ্যান' করে 'বাইট'-এর জন্য, তারপরই অন্য পাড়ায় চলে যায়। কিন্তু এবার যে কেস একটু 'জন্ডিস' মনে হচ্ছে।

সত্যিই ঘুম উড়ে গেছে এ-রাজ্যের পুলিশের, আর বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পুলিশবাহিনীর। স্বরাষ্ট্রদপ্তর থেকে কড়া বার্তা এসেছে, এবার জেগে থাকো, যে কোনও মুহূর্তে কোথাও একটা 'কিছু' হয়ে যেতে পারে। গোয়েন্দারা যেভাবে কোমর বেঁধে আতসকাচ আর দূরবীণ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে তাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জঙ্গিকুল আপ্রাণ চেষ্টা করবে গা ঢাকা দেওয়ার, কিংবা কোনওভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে চলে যাওয়ার। তাদের এই মরীয়া আনাগোনায় দুম করে ঘটে যেতেই পারে কোনও ভয়ংকর বিস্ফোরণ কিংবা রক্তক্ষয়ী 'এনকাউন্টার', যার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ জনজীবনের। অথচ অবাক কাণ্ড রাজ্যের তিন সীমান্ত জেলার পুলিশের বক্তব্য, তারা কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্য মোটেও প্রস্তুত নয়। তাদের প্রথম কথা, ছিঁচকে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি-জমি দখল ইত্যাদি নিয়েই তারা নাওয়া-খাওয়ার সময় পায় না। তার ওপর এসব উপরি 'টেনশন' নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, তাদের না আছে লোকলস্কর, না আছে অস্ত্রশস্ত্র, না আছে এসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ট্রেনিং। এমনকি গাড়ির অভাবে অনেক সময়ই তাদের ধরা পড়া চোরাই গাড়ি নিয়েই কাজ চালাতে হয়, ভাবা যায়?

এতদিন সবাই শুনে এসেছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার অপ্রতুল তাই চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা হয়। কিন্তু এই জেলাগুলিতে পুলিশকর্মীর অভাবের কথা বা তাদের অসুবিধার ওপর কখনই আলোকপাত হয় না। এমনিতেই পুলিশের 'দুর্দশা'-র কাহিনী লিখলে 'জনগণ খাবে না' বলে মিডিয়া ও পথে সচরাচর মাড়ায় না, তার ওপর উত্তরবঙ্গের পুলিস তো আরও দূরের ব্যাপার। অথচ পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে কোথাও একটা 'অঘটন' ঘটে গেলে স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর 'নিধিরাম' সেজে বসে থাকা ছাড়া কিছু করার থাকবে না। তখন মিডিয়া কিন্তু তার 'দায়িত্ব' নিষ্ঠা ভরেই পালন করবে, পুলিশ বাহিনীর অকর্মণ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণে উঠে পড়ে লাগবে, আর জনগণও ছেড়ে কথা বলবে না। এমনকি লোকাল যে সব নেতারা কথায় কথায় 'কলার' ধরতে চায় তারাও খ্যাক খ্যাক করে হাসবে। তারপর আসবে গোয়েন্দা বাহিনী, কেন্দ্রীয় বাহিনী, ঘনঘন রুট মার্চ হবে, চলবে একে অপরকে দোষারোপের লড়াই, আর পদে পদে অকারণ নাজেহাল হবে সাধারণ দৈনন্দিন জীবন।

দূরদর্শী বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চারদিকে যে সব সংকেত মিলছে তাতে আগত দিন খুব একটা সুখকর হবে না। হানাহানি, নাশকতা ইত্যাদি বেড়ে যাবে অপ্রত্যাশিত হারে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করাই হবে মূল লক্ষ্য, ফলে অপরাধের প্রতিকার করার মতো আর কেউ থাকবে না, বিচারকের নির্দেশও ইঁটের দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে হারিয়ে যাবে।

সত্যিই তো, পুলিশ কিংবা সাধারণ মানুষ, আগত সেই দিনের কথা ভাবলে আমরা সবাই অপ্রস্তুত !

বইমেলার মরসুমে রংরুটের বই

কেবল ক্যামেরায় নয়, ডায়রির পাতায় ভারত দর্শন। মূল্য ১০০ টাকা

এবারে রয়েছে সাগর সৈকত ধরে পশ্চিমে **গুজরাত** থেকে কোঙ্কন উপকূল বরাবর **মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, কেরালা** হয়ে **তামিলনাড়ু**। মূল্য ৬০ টাকা

উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত রাজ্য আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুণাচল বেড়াতে যাওয়ার হালহদিশ। মূল্য ১০০ টাকা।

জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল, গাড়োয়াল ও কুমায়ুন। প্রকাশ আসন্ন।
মূল্য ১২০ টাকা

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় তথা মধ্য ভারত। প্রকাশ আসন্ন।
মূল্য ১২০ টাকা

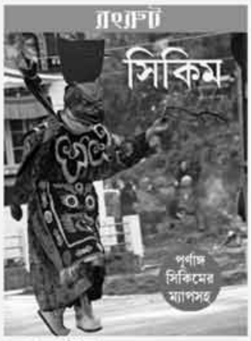

মূল্য ১০০ টাকা।

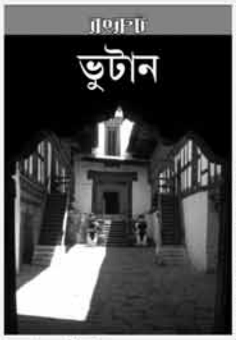

মূল্য ১০০ টাকা।

প্রকাশ আসন্ন। মূল্য ১০০ টাকা

মূল্য ১০০ টাকা।

মূল্য ১০০ টাকা।

মধ্যপ্রদেশ আবিষ্কারের দীর্ঘ কাহিনী বাংলায় সম্ভবত এই প্রথম।
মূল্য ২০০ টাকা।

প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১৫। মূল্য ৩০০ টাকা

মূল্য ৬০ টাকা।

এ কোনও ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফির গল্প নয়, একাহিনী অরণ্যের দিনরাত্রির। ক্যামেরা বাগিয়ে জঙ্গলে ছোটা মানুষের সংখ্যা আজ কম নয়, কিন্তু জঙ্গলে আস্তানা গেড়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটানোর অভিজ্ঞতা ক'জন শহুরে অরণ্য প্রেমীর আছে? ১২০ টাকা।

সব্যসাচী চক্রবর্তীর কেনিয়া সাফারির ভিডিও এবার DVDতে

উত্তরবঙ্গ বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে-জঙ্গলে।
মূল্য ১৫০ টাকা

আমেরিকার দশ কাহন
মূল্য ১২০ টাকা

প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১৫।
মূল্য ২০০ টাকা

মূল্য ৬০ টাকা।

মূল্য ১২০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

এই অবকাশে ১৮/৭ ডোভার লেন, কলকাতা ২৯, ফোন ৬৫৩৬০৪৬৩, ৯৮৩০৪৪০৮০৮
অক্সফোর্ড ১৫ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ১৬, ফোন ০৩৩-৩২৬২৪৬৮৫
মিনি বুক স্টল ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, ফোন ৯৮৩০৭ ৫৪৪৫৬
দে'জ পাবলিশিং হাউস ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, ফোন ২২৪১ ২৩৩০
এছাড়া স্টারমার্ক-এর সবকটি শোরুমে পাওয়া যাবে।

এখন ডুয়ার্স-এ যোগ দিন

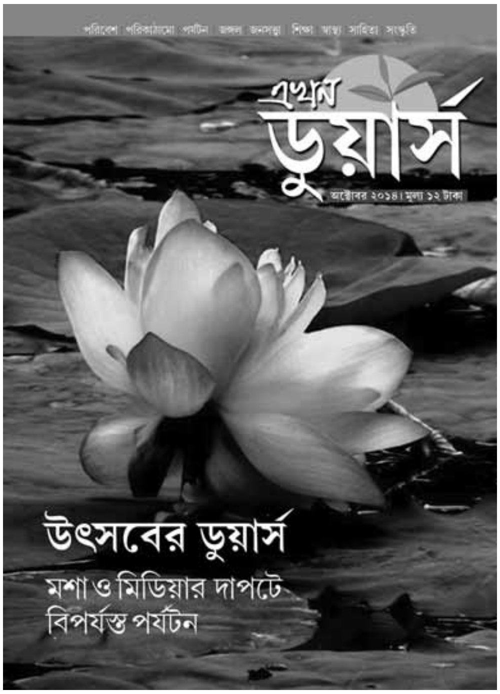

‘এখন ডুয়ার্স’ গ্রাহক নেওয়া শুরু হল

ঘরে বসেই ক্যুরিয়ার মারফৎ নিয়মিত ‘এখন ডুয়ার্স’ পেতে চান? জানুয়ারি ২০১৫ সংখ্যা থেকে চালু হয়ে যাচ্ছে সেই ব্যবস্থা। আপাতত দু’বছরের গ্রাহক চাঁদা নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও ঠিকানায় দু’বছরের গ্রাহক চাঁদা ক্যুরিয়ার চার্জসহ ৫০০ টাকা। ক্যুরিয়ার সার্ভিস না থাকলে তা সাধারণ ডাকে পাঠানো হবে। গ্রাহক চাঁদা অ্যাকাউন্ট পেয়ি ব্যাঙ্ক চেক মারফৎ পাঠান ‘এখন ডুয়ার্স’ দপ্তরে। চেক লিখবেন HOLIDAYAAR নামে।

‘এখন ডুয়ার্স’ ম্যাগাজিন স্টলে

শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মালবাজার, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, কোচবিহার, মাথাভাঙা ও আলিপুরদুয়ারে ম্যাগাজিন স্টলে খোঁজ নিন, না পেলে বলুন এনে দিতে। এজেন্ট সম্পর্কে খোঁজ নিতে যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৮ ৭৯৯৪৬ নম্বরে।

‘এখন ডুয়ার্স’ আপনিও লিখতে পারেন

ডুয়ার্সের মানুষ, জঙ্গল, পরিকাঠামো, সংস্কৃতি নিয়ে আপনি অবশ্যই লিখতে পারেন। লেখা অবশ্যই মৌলিক হতে হবে, আগে কোথাও ছাপা হলে বা অন্য কোথাও ছাপার জন্য ইতিমধ্যে পাঠিয়ে থাকেন তা খোলাখুলি জানাতে হবে। লেখা মনোনীত হলে ছাপার পর এক কপি সৌজন্য সংখ্যা লেখককে পাঠানো হয়ে থাকে। না পেলে দফতর থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

‘এখন ডুয়ার্স’ ছবি পাঠান

ডুয়ার্সের ল্যান্ডস্কেপ, বন্যপ্রাণ, জনজাতি, স্কুল-ক্লাব-হসপিটাল ইত্যাদি যে কোনও অর্থপূর্ণ ছবিই সাদরে গৃহীত হবে এবং ছাপা হবে। যারা নিয়মিত ছবি তুলছেন তাদেরকে বলব নির্দ্বিধায় ছবি মেইল করতে শুরু করতে। একবার নয় বারবার।

‘এখন ডুয়ার্স’ মহকুমা ভিত্তিক প্রতিনিধি প্রয়োজন

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার মহকুমা ভিত্তিক প্রতিনিধি প্রয়োজন। যাঁদের দায়িত্ব হবে মহকুমার অরাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার খবর নিয়মিত পাঠানো, পত্রিকা বিক্রি বাড়ানোর ব্যাপারে সেখানকার এজেন্ট ও ম্যাগাজিন স্টলগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের উৎসাহিত করা। আগ্রহী ব্যক্তিরা নিজস্ব বিবরণ ও ফোন নম্বর দিয়ে মেল করুন। ekhonduars@yahoo.com।

ডুয়ার্সের প্রবাসীরা যোগাযোগ করুন

আপনি কি জীবিকা বা লেখাপড়ার প্রয়োজনে ডুয়ার্সের বাইরে বসবাস করেন? কিংবা আপনার পরিচিত বা কোনও আত্মীয়বন্ধু জন্মসূত্রে ডুয়ার্সের হয়েও কর্মসূত্রে এখন অন্যত্র, বাইরের কোনও রাজ্যে বা বিদেশে থাকেন? তাদের নাম ও ঠিকানা আমাদেরকে মেইল করুন।

যারা ডুয়ার্সের মাটিতে জন্মেছেন, বড় হয়েছেন অথচ এখন দূরে কোথাও থাকেন, তাদের অনেকেই হয়ত আছেন বহুদিন এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, অনেকেই আবার কচিৎকদাচিৎ ডুয়ার্সে আসেন, কেউ কেউ আছেন নিয়মিত আসেন বা যোগাযোগ রাখেন—এদের সবাইকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছে ‘এখন ডুয়ার্স’। যেসব নাম-ঠিকানা আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে আমরা তাদেরকে পত্রিকাটি পাঠাব, পছন্দ হলে গ্রাহক হতে অনুরোধ করব, নিয়মিত চিঠিতে মেইলে যোগাযোগ রাখব, আর তাঁদের সেই চিঠিপত্র, লেখা, ছবি, স্মৃতিকথা সব নিয়মিত প্রকাশিত হবে ‘এখন ডুয়ার্স’-এর পাতায়। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যাঁরা ডুয়ার্সে জন্মেছেন এবং শৈশব কাটিয়েছেন তাঁরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন এই মাটির সুগন্ধ কখনই ভুলতে পারেন না। এই ডুয়ার্সের সৌন্দর্য, মানুষ, জঙ্গল, সুখ-দুঃখের কথা দুনিয়াকে জানাবার দায়িত্ব তাঁদেরই।

‘ডুয়ার্স’ নিয়ে ক্রমাগত বঞ্চনা, অবহেলা, কুম্ভীরাশ্রুর যাবতীয় জবাব দিতে হবে আমাদেরকেই। কোনও রকম রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাকে সযত্নে এড়িয়ে এই অভিনব উপত্যকাভূমির নিজস্ব প্রকৃতি-মানুষ-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিকে প্রাঞ্জল ভাষায় ও ভঙ্গিতে তুলে ধরতে চায় ‘এখন ডুয়ার্স’। খুব তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়তে চায় প্রত্যেক ডুয়ার্সপ্রেমীর মনের অন্দরমহলে।

‘এখন ডুয়ার্স’-এর এই অভূতপূর্ব উদ্যোগে যোগ দিন। আজই মেইল করুন নাম, ঠিকানা, একই অনুরোধ পাঠান আত্মীয়-বন্ধুদেরকেও।

জঙ্গি অভয়ারণ্যে নিরিবিলি করিডর ডুয়ার্স !

সেই ১৯৯৩ সালের বউবাজার বিস্ফোরণের দীর্ঘ একুশ বছর পর আবার। এবার খাগড়াগড়। চরিত্রগত ভাবে দুটিতে অদ্ভুত মিল। দুটির কোনওটিই জঙ্গিহানা নয়। বরং তাদের অসাবধানতার পরিণাম বাংলার সাধারণ মানুষকে আবার সতর্ক করে দিল, নাশকতামূলক জঙ্গি কার্যকলাপের 'কারখানা' আজও কিন্তু সেই পশ্চিমবঙ্গ। গত একুশ বছরে তাদের কাজকর্মের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে, রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থানের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তা প্রায় কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। তার ওপরে গোয়েন্দা বাহিনী বাংলাদেশ মুজাহিদিনদের নেটওয়ার্ক আবিষ্কার করে ফেলায় ফোকাসে এখন উত্তরবঙ্গের তিন জেলা এবং লোয়ার অসম বা এক কথায় সেই ডুয়ার্স। গোয়েন্দাদের আশংকা হল এই এলাকার জঙ্গি সংগঠনের মদত ছাড়া বাংলাদেশী জঙ্গিরা কোনওভাবেই এরাজ্যে তাদের জাল ছড়াতে পারে না। বাস্তবের সঙ্গে তাদের অনুমান কতটা মেলে চলুন তা যাচাই করে একবার দেখা যাক্।

জঙ্গি? না কি রক্ষী? নির্ধারন করা কঠিন (ফাইল চিত্র)

কেউ বলে সশস্ত্র আন্দোলন, আবার কেউ বা বলে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ। সে যাই হোক না কেন, দেশের আইন এবং সাধারণ মানুষের বৃহদাংশ একে কখনই সমর্থন করে না। উত্তরপূর্ব ভারতের অসম, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ও ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকর্ম বহুদিন ধরেই সুবিদিত। প্রতিবেশী দেশ নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের নানা জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পারস্পরিক প্রয়োজনে ক্রমাগত অশান্তির রাজ চালিয়ে আসছে এখানকার জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি। বিগত তিন দশকের হিসেব নিলে দেখা যায় উত্তরপূর্বের ছ'টি রাজ্যে নিত্যনতুন জঙ্গি সংগঠন গড়ে উঠেছে। কখনও একটি দল ভেঙে একাধিক, কখনও বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া গোষ্ঠীরই নতুন নামে ও কলেবরে

বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে তিন প্রান্তিক জেলা?

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ছড়িয়ে আছে জঙ্গিদের কার্যকলাপ। আপাত দৃষ্টিতে শান্তিপ্রিয় হলেও জঙ্গিদের করিডর হিসেবে বহু পূর্বেই পরিচিতি পেয়েছে ডুয়ার্সের এই তিন প্রান্তিক জেলা। ভৌগলিক কারণে জঙ্গিদের কাছে যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থান এই জেলাগুলির। এক সময় কে.এল.ও, উলফাদের আশ্রয়ের জায়গা হিসেবে পরিচিত এই জেলাগুলিতে বর্তমানে বেশ কিছু বেআইনি মাদ্রাসা ও বহিরাগতদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। গোয়েন্দাদের রিপোর্টে জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জে.এম.বি)-এর যোগাযোগের কথা জানানো হয়েছে। শহরের বাসস্ট্যান্ড চত্বর লাগোয়া বেশ কিছু এলাকায় বহিরাগত বহু মানুষ বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করছে। যাদের কোনও পরিচয় পত্র বলে কিছু নেই। বর্ধিত মূল্যে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন স্থানীয় মানুষ। বর্ধমান বিস্ফোরণের পরেও হুঁস ফেরেনি এই সব এলাকার মানুষদের।

অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য হিসেবে আগাগোড়া পরিচিত কোচবিহার। লাগোয়া বাংলাদেশ সীমান্তের একটা বড় অংশে নেই কাঁটাতার। ফলে, ভারত ও বাংলাদেশের বহু মানুষ অবলীলায় দুই দেশে চলাচল করতে পারে। সীমান্তে কাঁটাতারের বিষয়ে বিএসএফ নানা অসুবিধার কথা জানালেও আজও মেটেনি সমস্যা। তুফানগঞ্জ মহকুমার চরবালাভুত গ্রামের আশেপাশের এলাকায় প্রায় ১৯ কিমি জুড়ে কোনও বেড়া নেই। অবাধে চলে অনুপ্রবেশ এই এলাকা দিয়েও। এখানে মাদ্রাসা নিয়েও সন্দেহ দানা বেঁধেছে গোয়েন্দাদের। স্থানীয় মানুষ এসব নিয়ে মুখ না খুললেও বহিরাগতদের গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ জানিয়েছেন অনেকেই।

বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে আসামের বরপেটা জেলায় বিভিন্ন জায়গা থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছে ছ'জন। সিরাজ আলি খান, সইফুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, জহিরুদ্দিন, গোলাম ওসমানী ও সর্বেশ আলি। এর মধ্যে সইফুল ইসলাম ওরফে আবদুল্লা মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের বিভিন্ন মাদ্রাসায় জেহাদী ট্রেনিং দিত বলে আসাম পুলিশ সূত্রের খবর। বর্ধমান বিস্ফোরণের পর সইফুল বর্ধমান ছেড়ে আসামে আশ্রয় নেয়। আসাম তথা মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে যেমন সহজে ঢুকে পরা যায় তেমনই গোপন আশ্রয়ও মেলে সেখানকার স্থানীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর সহায়তায়।

এখানেই শেষ হয়নি উদ্বেগের কারণ। বাংলাদেশ থেকে আসা বহু পাসপোর্টধারী তাদের এদেশের মেয়াদ উত্তীর্ন হলেও আর ফেরৎ যায়নি। ফলে একটি ব্যাপক সংখ্যায় মানুষ অবৈধ ভাবে বাস করছে উত্তরের জেলাগুলিতে। সম্প্রতি তাদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রেফতার হলেও তা সংখ্যায় নিতান্তই খুব কম। সব মিলিয়ে এক বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের তিন প্রান্তিক জেলা। নিছক দুর্ঘটনা বসত বর্ধমান বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়ার পর গোয়েন্দা তৎপরতায় কিছু জঙ্গি কার্যকলাপ নজরে এলেও এখনও এই জেলাগুলিতে এমন বহু জায়গা রয়েছে যেখানে জেহাদীরা গোপনে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

ছবি ও প্রতিবেদন : সুকল্যাণ

আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। উত্তরপূর্বের দুর্গম পথ-ঘাট, অনুন্নয়ন, বঞ্চনা ও সেনা-পুলিশের নিপীড়নের সুযোগ নিয়ে তৈরি হয়েছে এইসব গোষ্ঠী। বছর দশেক আগে পাওয়া একটি তালিকা থেকে জানা যায় (কারা এই তালিকাটি করেছিল—গোয়েন্দা দফতর নাকি কোনও সাংবাদিক, তা অজ্ঞাত) অসম, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরায় একশ'রও বেশি জঙ্গি সংগঠনের নাম যার মধ্যে বেশিরভাগই পরবর্তীকালে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ পরিণত হয় তাদের আশ্রয় স্থলে। গভীর জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ি দুর্গম সীমান্তগুলিতে যেমন আত্মগোপন করা সহজ তেমনই সেখানকার উগ্রবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে বেআইনি বিদেশী অস্ত্র আমদানি করাও সহজ কাজ। কারণ জঙ্গিরা এটুকু ভালো করেই জানে হাজার প্রতিকূলতার মধ্যে এককভাবে অপারেশন চালানো অসম্ভব। তাই উদ্দেশ্য আলাদা হলেও সন্ত্রাস সৃষ্টিতে এদের অনেকাংশেই মিল পাওয়া যায়।

তেমনই অংকের স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই এই জঙ্গি নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে আমাদের রাজ্যের জঙ্গি সংগঠনগুলি। উগ্রবাদী

জঙ্গি ও মৌলবাদীদের এই অস্বাভাবিক সমীকরণে যথেষ্ট আশ্চর্য হতে হয়েছে গোয়েন্দাকুলকে। কারণ কামতাপুরের স্বপক্ষে আন্দোলনকারীরা তো বটেই, রাজবংশীদের সামগ্রিক মনোভাবই আগাগোড়া ছিল বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষ বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে। তাঁদের এই সেন্টিমেন্টকে ভাঙিয়ে ভোটবাক্সে নিজেদের উদ্দেশ্য সুকৌশলে এতদিন হাসিল করে এসেছে মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু আজ কিসের স্বার্থে এই উল্টো সমীকরণে রাজি হল কামতাপুরী জঙ্গি সংগঠনটি, তা নিয়ে ভাববার অবকাশ থেকে যায় বইকি।

কার্যকলাপে একই সারিতে রয়েছে মাওবাদীদের নাম। যদিও মাওবাদীদের দলিলে কোথাও বলা হয়নি যে অন্য সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের সঙ্গে প্রয়োজন পড়লে বন্ধুত্ব স্থাপন করা যায় কিংবা পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সঙ্গে সমঝোতা স্থাপন করে নাশকতামূলক কাজকর্মে মাওবাদীদের নাম জড়িয়ে পড়েছে। তবে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে উত্তরবঙ্গের মাটিতে নকশাল আন্দোলনের সূচনা ঘটলেও তার সঙ্গে পরবর্তীকালে এই শতাব্দীর গোড়ায় শুরু হওয়া মাওবাদী আন্দোলনের কোনও সাযুজ্য পাওয়া যায় না। পরবর্তী পর্যায়ে উত্তরবঙ্গে দানা বেঁধে ওঠার সুযোগ পায়নি মাওবাদীরা। কিন্তু সেই জায়গা পূরণ করেছে কে এল ও জঙ্গিরা। ডুয়ার্সের মাটিতে ২০০০ সালে সূচনা ঘটে, শীঘ্রই বড়সড় আকার ধারণ করে এই জঙ্গি আন্দোলন। তা প্রশাসনিক দমন প্রথায় পুরোপুরি থেমে গেলেও যে নির্মূল হয়ে যায়নি মোটেই, তার বড় প্রমাণ গত ফেব্রুয়ারি মাসের বিস্ফোরণ ও গোলাগুলি।

ইতিহাস বলে উত্তরবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবনা চিন্তার নিদর্শন মেলে স্বাধীনতার আগে থেকেই। রাজবংশীদের পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবিতে জঙ্গি আন্দোলনের সূত্রপাত নতুন শতাব্দীর সূচনা থেকেই। কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা কে.এল.ও-র নেতৃত্বে ডুয়ার্স জুড়ে শুরু হয়ে যায় খুন, অপহরণ, লুঠ ইত্যাদি হিংসাত্মক কার্যকলাপ। ভুটান ও বাংলাদেশ সীমান্তের বিভিন্ন গোপন ডেরায় উলফার মতো উত্তরপূর্বের জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে গাটছাড়া বাঁধে ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র ও নিরাপদ আস্তানার জন্য।

প্রত্যেকবারই কে.এল.ও-র উত্থানকে কড়া হাতে মোকাবিলা করেছে প্রশাসন এবং দক্ষ গোয়েন্দা বাহিনী। কিন্তু রোগ নিরাময়ের চাইতে রোগকে প্রতিরোধ করাটা বাঞ্ছনীয়—এই তত্ত্বে বোধ হয় বিশ্বাস করেন না আমাদের ঝানু গোয়েন্দারা। তাই বোধহয় রোগের প্রাথমিক উপসর্গ না ফুটে ওঠা পর্যন্ত চিকিৎসায় নামতে নারাজ তাঁরা। যেমন খাগড়াগড় বিস্ফোরণ না ঘটলে গোয়েন্দাদের পাওয়া একগুচ্ছ গোপন তথ্যকে হয়ত কখনই জোড়া দেওয়া যেত না, আর মানুষের সামনে আসত না সামগ্রিক সেই চিত্রটি। বিগত কয়েক বছর ধরেই যখন মানুষ জানত উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্সের মাটি থেকে জঙ্গিদের গন্ধ মুছে গেছে, সেই সময়ই কে.এল.ও গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করেছে নেপালের মাওবাদীদের সঙ্গে। নেপাল সেনাবাহিনীর অব্যবহৃত 'অস্ত্রশস্ত্র' বিপুল পরিমাণে পৌঁছেছে কে.এল.ও জঙ্গিদের হাতে, এবং তা বড়সড় অর্থের বিনিময়ে। গোয়েন্দাদের অনুমান, ২০১৩ সালে অসমের ধুবড়ি-কোকরাঝাড় ছাড়াও ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, কোচবিহার, তুফানগঞ্জ, মালদহ, কুমারগ্রাম ইত্যাদি জায়গায় বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ডাকাতির ঘটনা একসঙ্গে জুড়লে দেখা যাচ্ছে এক বছরে বেশ কয়েক কোটি টাকা তুলে থাকতে পারে এই জঙ্গি সংগঠন।

নেপালের মাওবাদীদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও আরও সহায়তার প্রতিশ্রুতির খবর মিলেছে গোয়েন্দা অ্যান্টেনায়। জঙ্গি লড়াইয়ে স্ট্রাটেজি নির্ধারণের জন্য মাওবাদীদের নিরবিচ্ছিন্ন পরামর্শের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু যে খবরে সম্ভবত দুঁদে গোয়েন্দাদেরও চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে তা হল বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিদিনের সঙ্গে কে.এল.ও-র 'ডিল', এবং তা নেপালের মাওবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এখনও পর্যন্ত যেটুকু বোঝা গেছে তা হল, চুক্তি অনুযায়ী কে.এল.ও কে অস্ত্র-বিস্ফোরক জোগাবে জামাত। আর তার বিনিময়ে জামাতকে ডুয়ার্সে নিরাপদ আস্তানার সন্ধান দেবে কে.এল.ও। যাতে তাদের পক্ষে বাংলাদেশ থেকে অসম হয়ে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে প্রাথমিক ঘাঁটি এবং তারপর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়া সম্ভব হয়। ঠিক একইভাবে ডুয়ার্সের মধ্যে দিয়ে নির্বিঘ্নে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ার পরিকল্পনাও যাতে ঠিকঠাক উতরে যায় সেই ব্যবস্থা করে দেবে কে.এল.ও।

জঙ্গি ও মৌলবাদীদের এই অস্বাভাবিক সমীকরণে যথেষ্ট আশ্চর্য হতে হয়েছে গোয়েন্দাকুলকে। কারণ কামতাপুরের স্বপক্ষে আন্দোলনকারীরা তো বটেই, রাজবংশীদের সামগ্রিক মনোভাবই আগাগোড়া ছিল বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষ বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে। তাঁদের এই সেন্টিমেন্টকে ভাঙিয়ে ভোটবাক্সে নিজেদের উদ্দেশ্য সুকৌশলে এতদিন হাসিল করে এসেছে মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু আজ কিসের স্বার্থে এই উল্টো সমীকরণে রাজি হল কামতাপুরী জঙ্গি সংগঠনটি, তা নিয়ে ভাববার অবকাশ থেকে যায় বইকি। গোয়েন্দারা কিন্তু এর পেছনে নেপালের উগ্রপন্থীদেরই মদত বা প্রভাব রয়েছে বলে মনে করছেন।

বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ অবাধে চলেছে দীর্ঘদিন টানা কয়েক দশক ধরে। অনুপ্রবেশকারীরা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশে, এখবরও সকলেরই জানা। এপারের রাজনৈতিক নেতাদের সংকীর্ণ স্বার্থের প্রশ্রয়ে তাদের রেশনকার্ড, ভোটারকার্ড মিলেছে নিয়মিত। সংবাদ মাধ্যমগুলি এনিয়ে দীর্ঘদিন গলা ফাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে প্রসঙ্গান্তরে

বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষায় নারীবাহিনী (ফাইল চিত্র)

চলে গেছে। সাধারণ মানুষের হাত ধরেই এদেশে প্রবেশ করেছে বহু দুষ্কৃতী, জঙ্গি, গুপ্তচর—নির্বিঘ্নে ডুয়ার্সের মাটিতে বসবাস করছে তারা। বৈধ নাগরিকের সচিত্র প্রমাণ নিয়ে। কারণ অল্পদিনেই তারা এটুকু বুঝে গেছে, এদেশে আইন যেমন কড়া তেমনই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েও অনেক কিছু করা যায়।

বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠার আদর্শ জমি কিন্তু এই ডুয়ার্স। তিস্তা-তোর্সা-রায়ডাকের দুই চরে জমে আছে দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস ও পুঞ্জীভূত হতাশা। ডুয়ার্সের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তা অব্যক্ত বেদনা হয়ে। শান্ত সমাহিত রূপসী ডুয়ার্সের স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে হয়ত আগুন হয়ে জ্বলে উঠতে পারে না, তবু ধূমায়িত হয় ক্ষোভ। শিল্প নেই, কাজের সংস্থান নেই, চাষবাস তো অলীক কল্পনা। নগরায়ণে জমি হারায় ভূমিপুত্র, হাতির অত্যাচারে চাষহীন পড়ে থাকে জমি। বাড়ন্ত বালক পেটের ভাত যোগাতে দিনমজুরের কাজের জন্য ছোটে পঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাত কিংবা প্রতিবেশী বিহার বা নেপাল-ভুটানে। কাহিনীর এই পর্যন্ত আমাদের সরকার বা রাজনৈতিক নেতা বা প্রশাসনিক কর্তা সকলেরই ভালো করে জানা। বা শুনে শুনে হয়ত কান পচে যাওয়ার যোগাড়। কিন্তু আগামীকাল সেই বাড়ন্ত কিশোর যদি ভিন্ রাজ্যে দিন মজুরির পরিবর্তে রোজগারের অনেক সহজ উপায় হিসেবে স্বয়ংক্রিয় বন্দুক হাতে ঘুরতে শুরু করে কিংবা ঘরে ঘরে বিছানার নিচে মজুত করে বিস্ফোরকের বাক্স তখন তার তৎক্ষণাৎ মোকাবিলার পদ্ধতি সম্পর্কে আগাম প্রস্তুতি কি আদৌ আছে? নাকি 'চিকিৎসা' শুরু হবে সবকিছু ঘটে ও মিটে যাওয়ার পরে?

শুভঙ্কর সরকার

ডুয়ার্সে হাতি আজ বিপন্ন ! নাকি বিপর্যয় !

এতদিন অভিযোগের আঙুল ছিল মূলত রেল দফতরের দিকে। দ্রুত ধাবমান শকটের ধাক্কায় ক্রমাগত হস্তি নিধন ক্রমাগত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হতে অনেকাংশেই আজ আপাত সমাধান সূত্র বেরিয়েছে। বিকল্প রেলপথ ডাবল লাইনের জন্য বাজেট বরাদ্দ, তা না হওয়া পর্যন্ত যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা কমানো, মালগাড়ি চলাচল রদ, সন্ধে থেকে ভোর পর্যন্ত ট্রেনের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বন্যপ্রাণ প্রেমীরা। কিন্তু যে সমস্যাটি এতদিন ফোকাসে ছিল না সেটিই এখন প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডুয়ার্সে হাতির সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, বনসংলগ্ন বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ত সংঘাত এমন পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে যে তাকে অনতিবিলম্বে বিপর্যয় আখ্যা দেওয়াটা খুব একটা ভুল কিছু নয়। গুলি করে হাতি মেরে ফেলা নাকি হরমোন প্রয়োগে জন্মনিয়ন্ত্রণ—আদৌ কি সম্ভব এই অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের মোকাবিলা ?

কেনিয়ার মাসাইমারা-অ্যাবারডেয়ার-আম্বোসেলি ন্যাশনাল পার্ক বেড়াতে গিয়ে ক'টা দিন শয়ে শয়ে আফ্রিকান হাতি দেখেছিলাম খুব কাছ থেকেই। কখনও গাড়ির জানলা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট, কখনও তিনতলা বাড়ির ছাত থেকে নীচের উঠোনে। দলে দলে হাতির পাল নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করছে, জল বা খাবার খেতে ব্যস্ত, তার মধ্যেই কড়া নজর রাখছে আমরা কী করছি তার ওপর। একবার তো বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। আম্বোসেলিতে একটা জায়গায় জলাভূমিতে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল একটা বড় দল । হঠাৎ দেখলাম দলপতি গোছের একটা মাকনা পাহাড়ের মতো সাইজের চেহারা নিয়ে বিশাল বিশাল কান দোলাতে দোলাতে আমাদের গাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে আরও দুটি। আমরা শ্বাসরোধ করে বসে আছি, ক্যামেরার শাটার টেপাও বন্ধ কারণ টেলিলেন্সের গোটা ফ্রেম জুড়ে সেই পাহাড়। খুব কাছে আসতেই ভয়ে বোধহয় একবার চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম, ঈষৎ দুলুনি হতেই চোখ খুলে দেখলাম গাড়িটার গা সামান্য ছুঁয়ে সেই ঐরাবত আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল খানিক দূরের একটি জলাশয়ের দিকে। সাহস করে হাত বাড়ালেই তার গা-টা ছুঁতে পারতাম।

সেদিন সন্ধ্যায় সেই রোমহর্ষক পরিস্থিতির কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় অবধারিতভাবেই উঠে এসেছিল একটি প্রশ্ন, আমাদের দেশের কোথাও, ধরা যাক ডুয়ার্সের জঙ্গলে, বেড়াতে গিয়ে এত কাছ থেকে নিশ্চিন্তে হাতি দেখা কি সম্ভব ? তার ঝটিতি উত্তর হল, কল্পনাই করা যায় না। কিংবা না দেখা হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কারণ এখানকার বুনো হাতি মানুষ দেখলে এত দ্রুত উত্যক্ত হয়ে ওঠে যে তারা কখন কী ভাবে আচরণ করবে তা বলা মুশকিল। আমাদের দেশের ঐতিহ্য-পুরাণ-সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা দেবতা হিসেবে পূজিত এই বিশালকায় প্রাণী আমাদের হাতেই যুগে যুগে এত লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত যে মানুষের সংস্পর্শে এসেই তারা অতি সহজেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আজ বিশেষজ্ঞরা যখন বলছেন, এশিয়ায় বাঘের চাইতেও অনেক তাড়াতাড়ি অবলুপ্তির পথে চলে যাবে হাতি, তখন হাতির ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় রীতিমত বিপর্যয়ের সম্মুখীন ডুয়ার্স-তরাইয়ের জঙ্গল সংলগ্ন মানুষ। কপালে কুঞ্চন বনদফতরের অভিজ্ঞ

কর্তাদের। মিটিং-ওয়ার্কশপ-অ্যাকশন প্ল্যান কোনও কিছুতেই সমাধান মিলছে না, বরং সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে।

আরও অনেকের মতোই হাতিই আমার প্রিয়তম বন্যপ্রাণ, যদিও আরও অনেকের মতোই জ্ঞান হওয়ার পর হাতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় সার্কাসের তাঁবু কিংবা রাজেশ খান্নার 'হাতি মেরে সাথি'-তে নয়। জীবনের প্রথম কুড়িটা বছর ডুয়ার্স চত্বরে বেড়ে ওঠার সুবাদে পথেঘাটে যেমন যখনতখন দেখা পেয়েছি তাদের, তেমনই লোকালয়ে ঢুকে তাদের লণ্ডভণ্ড করার নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য অতি পরিচিত সেই ছোটবেলা থেকেই। একটু বড় হতেই জেনেছি হাতি মূলত যাযাবর শ্রেণির, একটি বিশেষ রুটে তারা সদলবলে বছরভর চক্কর কাটে বছরের পর বছর একইভাবে। সভ্যতা যতই হাত বাড়ায় জঙ্গলের সীমানায়, তাদের চিরকালীন চলার পথ আটকে মানুষ বাড়িঘর বানায়, ফসল ফলায়। ফলে অবধারিতভাবে শুরু হয় সংঘাত। ছোট্ট থেকে যে শিশু হাতিটি খিদে মেটাতে বড়দের সঙ্গে ফসল খেতে নেমেই মানুষের তাড়া খেয়ে পালাতে অভ্যস্ত, খিদে পেটে দিনভর জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে খাবারের খোঁজে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হাঁটতে বড় হয়েছে তার স্মৃতিতে মানুষ সম্পর্কে বিদ্বেষ ছাড়া আর কীই বা জমতে পারে!

ডুয়ার্সের মাটিতে দাঁড়িয়ে আজকের সামগ্রিক চিত্র কী?

পুবে সংকোশ নদী পেরোলেই আসাম, সেখানে চোরাশিকারিদের আক্রমণ আর পশ্চিমে মেচি নদী পেরোলেই নেপাল, সেখানে ফসল পাহারাদারদের নির্বিবাদে গুলি। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় বলতে বক্সা, জলদাপাড়া, গরুমারা, চাপড়ামারি ও মহানন্দা অভয়ারণ্য, যেখানে খাবার ও পানীয় জল মোটামুটি মিলে যায়। বিপদটা হল সেখানেই। এর ফলে একই জায়গায় বাড়তে শুরু করল হাতির জন্ম-উৎপাদন। দশ বছরে যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ। সেই অনুপাতে জঙ্গল বেড়েছে ১.৭ শতাংশ। স্বাভাবিকভাবেই খাদ্যের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। খাদ্যাভাবে লোকালয়ে ফসলের লোভে ঢুকে পড়ছে হস্তি বাহিনী, খেয়ে-মাড়িয়ে তছনছ করছে, বাড়িঘর ভাঙছে, জখম বা নিহত হচ্ছে মানুষ ও গবাদি পশু। 'মহাকাল' দেবতা হিসেবে পূজিত ঐরাবতের দল স্থানীয় দরিদ্র মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। মানুষ-হাতির অস্তিত্বের সংঘাত আজ চূড়ান্ত পর্যায়ে। রাতের পর রাত মশাল জ্বালিয়ে খেত পাহারা দিয়ে পটকা ফাটিয়ে ক্লান্ত জঙ্গল সংলগ্ন দরিদ্র মানুষ। প্রখর বুদ্ধিমান হাতির দল সে সবকেও ফাঁকি দিতে শিখে গেছে। সংঘাতের মাত্রা আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে, অস্তিত্বের তাগিদে একে অপরকে মরীয়া হয়ে আক্রমণ করছে। ধৈর্যের বাধ ছাড়িয়ে যেতেই, ফসল খেতে

খোলা বিদ্যুতের তার ছড়িয়ে রাখছে জেল-জরিমানার ভয়কে অগ্রাহ্য করে। তড়িতাহত হয়ে হাতি মৃত্যুর খবর আজ প্রায় নিয়মিত ও অতি পরিচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে বিশেষজ্ঞরা যেমন বলছেন সংঘাত এরকম চললে ডুয়ার্সে তথা উত্তরবঙ্গে বিপর্যয় অনিবার্য তেমনই হাতির সংখ্যা বৃদ্ধিতে যে বন দফতরের গর্বিত হওয়ার কথা তারাই আজ চূড়ান্ত অসহায় বোধ করছেন। আজ বনদফতরের সামনে চ্যালেঞ্জ একাধিক।

এক, খেত ফসল ঘরবাড়ি ধ্বংস করার ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে বহু টাকা বন দফতরের আয় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার পরিমাণ বাড়ছে বই কমছে না।

দুই, বনদফতরের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তুলনায় কম মনে হওয়ায় অসন্তুষ্ট গ্রামবাসীরা বেআইনি হাতি নিধনে লিপ্ত হচ্ছে, ফলে সংরক্ষণ বিরোধী কার্যকলাপ ক্রমশই ইন্ধন পাচ্ছে যা সমগ্র বিশ্বের চোখে চরম নিন্দনীয়।

তিন, গ্রামবাসীদের অসন্তুষ্টি-ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে চোরাশিকারিরা যে ফের ঘাঁটি গাড়ার সুযোগ পাচ্ছে তা দৃশ্যতই স্পষ্ট।

চার, হাতিদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বনাঞ্চলের পরিমাণ সমানুপাতে বাড়ানো ভীষণ জরুরি, কারণ হাতির সংখ্যা বৃদ্ধি কোনওভাবে রোধ করা সংরক্ষণ পরিপন্থী।

পাঁচ, হাতিদের চলাফেরার উপর সর্বক্ষণের নজরদারি, যার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব।

ছয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত চেতনাবোধ বাড়ানোর ব্যবস্থা এবং তার জন্য মিডিয়া ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে কাজে লাগানোর সদর্থক প্রয়াসে গড়িমসি।

সাত, প্রশাসন, বিদ্যুৎ, পর্যটন, দমকল ইত্যাদি সরকারি অন্যান্য দফতরের সঙ্গে সর্বক্ষণের সমন্বয় রাখা ভীষণ জরুরি। যাতে যে কোনও আপৎকালীন অবস্থায় দ্রুততার সঙ্গে কাজ করা যায়।

আট, বিভিন্ন দফতরকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিয়ে হতে পারে অ্যাকশন প্ল্যান যার রূপরেখা আজ পর্যন্ত ভেবে বের করা যায়নি।

বিপর্যয়ের মোকাবিলা সম্ভব?

বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিতে যেটা সবচাইতে জরুরি সেটিকে খুঁজে বের করতে হবে। বিশেষজ্ঞ না হয়েও এটুকু বোঝা যায়

যে বনাঞ্চলের পরিমাণ বাড়ানো রাতারাতি সম্ভব না হলেও জঙ্গলের ভেতর ফাঁকা জায়গা চিহ্নিত করে সেখানে হাতিদের পছন্দের খাদ্য বিশেষ প্রজাতির ঘাস লাগানো যেতে পারে যা দ্রুত করা সম্ভব। গুলি বা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে যদি সংকোশ বা মেচি নদী পেরিয়ে অসম বা নেপালের জঙ্গলে প্রবেশে হাতিদের অনীহা দেখা যায় তো সেই সমস্যাকে কী করে দ্রুত বিশ্লেষণ ও তার সমাধান করা যায় তা দেখা যেতে পারে। ডুয়ার্সের আদি জনজাতির মানুষেরা কিন্তু হাতি নিধনের পরিপন্থী। একটু ভালো করে খোঁজ নিলেই দেখা যাবে যেখানে ফসল খেতে তড়িতাহত হয়ে হাতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে সেখানে হয় উদ্বাস্তু জনজাতির বসবাস নতুবা বেআইনি বা খাস জমিতে চলছে ফসল চাষ। প্রশাসনের সহযোগিতায় বন দফতর দৃষ্টান্তমূলক দু-চারটে শাস্তি দিলেই এই ধরনের নির্মম ঘটনা অনেক কমে যাবে।

সভ্যতার বিস্তারকে যেমন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, তেমনই অরণ্যভূমিকেও কমানো যাবে না। পাশাপাশি সহাবস্থানে ঠোকাঠুকি লাগবেই। কিন্তু এটাও ঠিক শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও হাতিবাহিনী যে বারংবার লোকালয়ে বা ফসল খেতে ফিরে আসে তা কখনই শখ করে নয়। তাদেরকে অন্যত্র চলে যাওয়ার পথ দেখালেই তারা চলে যাবে। কারণ একটা কথা সবসময় মাথায় রাখতে হবে, মানুষের সঙ্গে সহাবস্থান নেহৎ বাধ্য হয়েই, তাদের কাছে তা কখনই কাম্য নয়।

আর একটি বাস্তব সত্য সবাই মেনে নেবেন, আশা করছি বন দফতরের কর্তারাও। হাতিদের চেহারার মতোই এই বিশাল দায়িত্ব পালন করা বনদফতরের একার নয়। এর জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে বিশেষজ্ঞদের, ভুক্তভোগী মানুষের প্রতিনিধিকে, সংরক্ষণবাদী সংগঠনগুলিকে, কবে প্লেনের টিকিট ও নিমন্ত্রণ আসবে তার অপেক্ষা না করেই। দফায় দফায় আলোচনা হোক, প্রস্তাব-পাল্টা প্রস্তাব চলুক, প্রয়োজনে ভিডিও কনফারেন্সিং করে জেনে নেওয়া যেতে পারে দূরের ভিনদেশীদের অভিমত। অ্যাকশন প্ল্যান তার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসতে বাধ্য। প্রথমবারের জন্য আহ্বায়ক অবশ্য হতে হবে সেই বন দফতরকেই।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের পর্যটন আজ বড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি

হঠাৎ করেই এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে পড়তে হল কেন? গত বছরও তো চলছিল রিসর্টের জমি কেনার হিড়িক। জমির দামও বাড়ছিল রকেটের গতিতে। সব থমকে গেল কেন? তবে কি হুজুগটাই বেশি ছিল? নাকি আমাদের প্রত্যাশাই অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল? প্রথম ধাপে সফল হলেও পরবর্তী ধাপে উন্নতির জন্য এখনও উপযোগী নয় ডুয়ার্স? বিশ্লেষণ বা অন্বেষণ যা করার এখনই শুরু করে দিতে হবে। মোদ্দা কথা হল দোকান যখন একবার খুলে বসা হয়েছে তখন তা বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হল খদ্দের আনা। সরকার কবে বাঁচাতে এগিয়ে আসবেন তার ভরসায় না থেকে নিজেদের উদ্যোগে শুরু হোক প্রচার এবং তা শুরু হোক নিজের নিজের মহল্লা থেকেই।

পর্যটকদের হৈ-চৈ হঠাৎ করেই কেমন যেন বন্ধ হয়ে গেল

মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে সব আয়োজন ঃ তুলনায় পাহাড়ে সাশ্রয়

অগাধ ঐশ্বর্য নিয়ে যেন অপেক্ষাই করছে ডুয়ার্স। প্রকৃতিতে সমস্ত মহার্ঘ্য তৈরি। অসাধারণ ল্যান্ডস্কেপ। তিরতিরে নদীরা বিছিয়ে রেখেছে মোহজাল। চা-বাগানগুলো সবুজে সবুজে মহীয়সী। অনন্ত আকাশ নানান রঙের সম্পদ নিয়ে ডুয়ার্সে প্রতিদিনই অন্যরকম, চোখ ফেরানো দায়। অরণ্য অপার রহস্যে সাজিয়ে রেখেছে তার গাছপালা লতাপাতা বাঘ-হাতি-হরিণ-বাইসন-সাপ-বাঁদর পাখপাখালি প্রজাপতি-কীটপতঙ্গ... আরও কত্ত কী! আঁকাবাঁকা পথসমুহ ডাকতে থাকে, ডাকতেই থাকে। ভুটান পাহাড়ের ক্যানভাস শরৎ-হেমন্ত থেকে আরও বেশি চোখ-কাড়ানিয়া! শীতে তো মোহময়। অরণ্য-নদীঝোরার সহবাসে, ঝিঁঝির বন্য সাইরেনে নাগরিক গ্লানি নিমেষে দূরে পালায়। চা-বাগান বা অরণ্য পথে হাঁটতেও তো ভাল লাগে। মুক্তি ছুঁয়ে যায় সমস্ত শরীর-মনকে।

উত্তরবঙ্গ সুইজারল্যান্ড না হোক, তার নিজস্ব সৌন্দর্যে সৌকর্যে মহিমাময় হয়ে

উঠতে পারে। অথচ এবারের পুজোর ঋতু সে চুপচাপ পড়ে থাকল। পর্যটকেরা বেমালুম ভুলে থাকলেন রূপসী ডুয়ার্সকে। অসংখ্য বিলাসবহুল রিসর্ট ও বাংলো গড়ে উঠেছে ডুয়ার্সের নানান প্রান্তে, সরকারি এবং বেসরকারি। থাকবার সুবন্দোবস্তের অভাব অনেকটাই ঘুচেছে। কিন্তু পর্যটকেরা দার্জিলিং সিকিমের পাহাড়ে গেলেন, ডুয়ার্সে এলেন না। বেসরকারি রিসর্ট হোটেল মালিক ও কর্মীদের মাথায় হাত।

সদ্য ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এই প্রশ্ন মনে নিয়ে। পর্যটকেরা কেন এলেন না? ডুয়ার্স কেন তাদের টানল না? কথা হল বেশ কিছু রিসর্টের সঙ্গে।

যেমন মূর্তিকে বিগত বছরগুলিতে ডুয়ার্সের অন্যতম আকর্ষণীয় টুরিস্ট স্পট হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। অপূর্ব তার ল্যান্ডস্কেপ। টলটলে গাঢ় নীল বা রূপোলী জলস্রোত নিয়ে উপলমুখর ছন্দে বয়ে চলেছে মূর্তি নদী। নদীর গায়ে গা লাগিয়ে অরণ্য। হাতিরা এসে জল খেয়ে যায় নদীতে। ব্রিজ পেরিয়ে অরণ্যপথে পা ফেললেই দেখা মেলে ময়ূরের; হাতের নাগালে বনমোরগের ঝাঁক। ছমছমে রাস্তাও নেশা ধরায়। মূর্তি নদীকে পাশে নিয়ে গড়ে উঠেছে অনেকগুলো রিসর্ট। ধোপদুরস্ত একটি রিসর্টে ঢুকে ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। পুজোর ছুটিতে কেমন ব্যবসা হল? - এই প্রশ্নটা ছুঁড়তেই মনে হল মৌচাকে ঢিল দিয়ে ফেললাম। ভদ্রলোকের চোখে প্রায় জল চলে এল। বললেন, 'ডুয়ার্সের কিচ্ছু হবে না মশাই। কেউ এখানকার উন্নতি চায় না। না সরকার, না মিডিয়া, না জনগণ। ডুয়ার্সের পর্যটন নিয়ে অনেক বড় বড় কথা হলেও কাজের কাজ কিচ্ছু হচ্ছে না। গত দু-মাস কোনও টুরিস্ট নেই। শুধু ছাত্রছাত্রীদের একটি গ্রুপ এসেছিল, আমার অনেকগুলো ভাল এসি রুম সুইমিং পুল খেলার জায়গা রয়েছে বলে নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দলগত ভ্রমণদলের আগমন। সাধারণ পর্যটক কেউ আসেনি।'

এক একটি রিসর্ট ব্যবসা না করতে পেরে দিনের খরচ মেটাতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। এক হোটেল ম্যানেজার বললেন, 'মালিকের কাছ থেকে মাসমাইনে নিতে লজ্জা হচ্ছে। এত টাকা ইনভেস্ট করে রিসর্ট বানিয়েছেন, লাভ তো দূরের কথা, প্রাত্যহিক খরচ উঠছে না।'

লাটাগুড়ির একটি অপূর্ব সুন্দর রিসর্টের কর্তা জানালেন, লিজের টাকা সুদে ধার করে এ বছর দিতে বাধ্য হলেন। পর্যটক গরুমারায় খুব কম এসেছে।

কেন এই অবস্থা? প্রবীণ হোটেল ম্যানেজার, যিনি দু-দশক হোটেল ব্যবসায়

এন.জে.পি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে শেয়ার গাড়িতে দুটো সিট ভাড়া করে টুরিস্ট-দম্পতি অনায়াসে চলে যেতে পারেন গ্যাংটক, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং। কিন্তু তারাই যদি লাটাগুড়ি বা মূর্তি কিংবা বিন্দু-ঝালং যেতে চান, তবে একটি আস্ত গাড়ি নিজেদের ভাড়া করতে হবে। আর জঙ্গলে ঢুকতে হলে সরকারি কার সাফারি বাধ্যতামূলক। কিন্তু যে রেট করে দেওয়া হয়েছে তাতে সরকারি উদ্যোগ যেন বেসরকারি মানসিকতাকেও ছাপিয়ে যায়।

হলং বনবাংলো চত্বরে হাতের নাগালে বন্যপ্রাণের সমাবেশ প্রত্যক্ষ করার উত্তেজনাই আলাদা

ছবি : ডা. প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

যুক্ত রয়েছেন, বললেন ডুয়ার্সের এই সমস্যার কারণ অনেকগুলি। যারা বেড়াতে যাবেন বলে সারা বছর আস্তে আস্তে সঞ্চয় করেন, সেই মধ্যবিত্ত মানুষদের সংখ্যাই পর্যটকের তালিকায় বেশি। তাদের জন্য ডুয়ার্স অকারণেই অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ, এক্সপেনসিভ। এন.জে.পি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে গাড়িতে দুটো সিট ভাড়া করে টুরিস্ট-দম্পতি অনায়াসে চলে যেতে পারেন গ্যাংটক, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং ইত্যাদিতে। কিন্তু তারাই যদি লাটাগুড়ি বা মূর্তি কিংবা বিন্দু-ঝালং যেতে চান, তবে একটি গাড়ি নিজেদের ভাড়া করতে হবে। বাস চলাচল করলে যেখানে দুজনে একশো টাকায় আসা যেত, সেখানে দশ-পনের গুণ বেশি টাকা দিয়ে ছোটগাড়ি আস্ত ভাড়া করতে হবে। এন.জে.পি থেকে যাওয়া আসাতেই বেরিয়ে যাবে মোটা অঙ্ক। সে গাড়ির আবার নেই কোনও ফিক্সড রেট। চালসা থেকে মূর্তি মাত্র ১৩ কিমি রাস্তা ভাড়ার গাড়িতে আসতে তিনশো-চারশো টাকা লেগে যায়, তারপর বেড়ানোর গাড়ি। সেও এক বড় ঝক্কি।

জঙ্গলে ঢুকতে হলে সরকারি কার সাফারি বাধ্যতামূলক। কিন্তু যে রেট করে দেওয়া হয়েছে তাতে সরকারি উদ্যোগ যেন বেসরকারি মানসিকতাকেও ছাপিয়ে যায়। পুরনো গাড়ি রঙ করে নতুন বানানোর চেষ্টা। আর তাতেই মাত্র ৩০/৩৫ কিমি জঙ্গল সাফারির গাড়ি ভাড়া সতের-আঠারশ টাকা! গাইড নিতেই হবে। তার মাশুল ১৫০ টাকা। অথচ সে অর্থে কোনও গাইডেন্সই মিলবে না তাদের কাছ থেকে। গাড়ির একজন বাড়তি সওয়ারি হয়ে নিছক বনভ্রমণে যাবেন গাইড নামে অপ্রশিক্ষিত একজন করে লোক। যারা না চেনাতে পারেন গাছপালা, না পাখপাখালি। ঠিকঠাক বলতে পারেন না বনজঙ্গলের এলাকার ভূগোল। জঙ্গল সাফারিতে গিয়ে কার পার্কিংয়র জন্য আবার একশো টাকা আলাদা গুণতে হবে। কেন গাড়ি রাখার জায়গা করে দেওয়া যায় না? কার সাফারির টাকা দেবার বাইরেও জঙ্গলের এন্ট্রি ফি দিতে হবে।

পকেট হালকা করে দেবার বিস্তর সরকারি উদ্যোগ। সরকারি বাংলোর ভাড়া আঁতকে ওঠার মতো। প্রশ্ন জাগে ভ্রমণকে কি সরকার শুধুমাত্র বড়লোকদের বিলাসিতায় পরিণত করতে চাইছেন। ধূপঝোরার গাছবাড়িতে থাকবার ঘরভাড়া চার হাজারেরও বেশি হবার কী যুক্তি থাকতে পারে? ইচ্ছে থাকলেও মধ্যবিত্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন দূর থেকে।

হাতির পিঠে উঠে বুনোপথে পর্যটনে না গেলে কি ডুয়ার্স ভ্রমণ সার্থক হতে পারে? অথচ হাতিতে উঠতে হলে সরকারি বাংলো বা রিসর্টে থাকা বাধ্যতামূলক। বেসরকারি উদ্যোগীরা কী দোষ করলেন! পরিষেবাটা আর একটু কি বিস্তৃত করা যায় না?

মূর্তিতে এক রিসর্ট ম্যানেজার বলছিলেন, 'আপনি শুনলে লজ্জা পাবেন। পর্যটন মানচিত্রে যে জায়গাটির এত গুরুত্ব, সেখানে সাইকেল মোটরবাইক করে কাতারে কাতারে মানুষ প্রতিদিন সকালবেলা নদীর ধারে মলত্যাগ করতে আসেন। মূর্তিতে কোনও শ্মশান নেই। রূপসী নদীর চর হয়ে ওঠে দাহস্থান।' মানুষের সচেতনতা ও মমত্বের অভাবও তাই থেকে গেছে ডুয়ার্সের পর্যটন বিকাশে। রয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক চাপ। স্থানীয় দাদাগিরি সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেও উচ্চবাচ্য করা মুসকিল।

এক রিসর্ট কর্তা বললেন, 'মিডিয়াও এবার ডুয়ার্সের ভাল করার চেয়ে ক্ষতি করেছে অনেক বেশি। এনকেফেলাইটিস নিয়ে যে ভয়ানক প্রচার মিডিয়া চালিয়েছে, তাতে পর্যটনের বারোটা বেজে গেছে। আপনি বলুন তো, এখানে কি সত্যি মহামারী হয়েছে? হয়নি। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে মহামারীর ছাপ দিয়ে দিনের পর দিন শিরোনাম করা হয়েছে। পর্যটকেরা অযথা আতঙ্কিত হয়েছেন। ডুয়ার্সে গেলেই বুঝি এনকেফেলাইটিস বা ডেঙ্গু হবে। মূর্তি, লাটাগুড়ি, মাদারিহাটে ক'জন এনকেফেলাইটিসে মরেছে? অথচ প্রচার এমন হয়েছে যেন ঘরে ঘরে মৃত্যুমিছিল! — এর বদলে মিডিয়া যদি ডুয়ার্সের নৈসর্গিক আবেদনকে বেশি করে তুলে ধরত অনেক বেশি উপকার হত।'

প্রবীণ রিসর্ট ম্যানেজার পার্থ মিত্র বলছিলেন, 'মানুষকে ঘুরতে দেওয়া হোক স্বাধীনভাবে। ডুয়ার্স তাদের জন্য অনেক সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে বসে আছে। শেয়ারিং বেসিসে বাস বা ট্যাক্সিতে ডুয়ার্সের নানান টুরিস্ট স্পটে যাবার ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করা দরকার। এন.জে.পি স্টেশন বা পি.সি.মিত্তাল বাস স্ট্যান্ড থেকে অনেক বেশি বাস চালু করা দরকার। ডুয়ার্সে আসা-যাওয়াটা যেন সহজ হয়।'

অমিত কুমার দে

বিদেশী নয়, চাই দিশি টুরিস্টের ভিড়

এবারের পুজোর মরশুমে ডুয়ার্সের পর্যটনে অভাবনীয় মন্দা নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। পুজোর ক'টা দিন বাদ দিলে গোটা অক্টোবর মাস বসে বসে হতাশায় আঙুল চুষেছেন বেসরকারি হোটেল-রিসর্ট-ভাড়াগাড়ি-জিপসির মালিকেরা। এ বছরের এই হঠাৎ-মন্দা আগাম আন্দাজ করেনি কেউই। নভেম্বর মাসটা ছেড়ে দিন, আগামী ডিসেম্বর মাসের অগ্রিম বুকিংও সেরকম আশাপ্রদ নয় বলেই জানা গেছে।

রাজ্য পর্যটন দপ্তর অবশ্য এনিয়ে কতটা ভাবিত তা নিয়ে সংশয় থেকে যায় বইকি। ব্যবসার এই শোচনীয় হাল নিয়ে যখন রিসর্ট মালিকরা দুশ্চিন্তায় মাথায় হাত দিয়ে ভাবছেন আগামী মাসগুলিতে ছেলেদের মাইনে যোগাবেন কোত্থেকে, সেসময়ই পর্যটন দপ্তরের আমন্ত্রণে ডুয়ার্সে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ইওরোপের পর্যটন প্রতিনিধির এক বড় দল। তাঁরা নাকি ডুয়ার্সের সৌন্দর্য দেখে এতটাই মুগ্ধ যে দেশে ফিরে গিয়েই তাঁরা দলে দলে সাদা টুরিস্ট পাঠাতে শুরু করবেন। আর তাতেই ডলারে ডলারে ভরে উঠবে আমাদের কোষাগার। অতএব ডুয়ার্সের পর্যটনের পালে এবার যে হাওয়া লাগবে তা আগামী বেশ কয়েকটা মরশুম নিশ্চিন্তে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

পর্যটন কর্তাদের এহেন উর্বর মস্তিষ্কের নমুনা বিস্ময় ও প্রশংসার দাবি রাখে বইকি। এর আগে এঁরা আর কোন কোন দফতরের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্মাণ করে এসেছেন তা আমার জানা নেই। তবে এটুকু তাঁদের জানা থাকা উচিত যে, ডুয়ার্সের অরণ্যভূমিতে পর্যটকের রমরমা শুরু হয়েছিল মূলত দার্জিলিং পাহাড়ের পথ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার জন্যই। পরবর্তীকালে কিঞ্চিৎ শান্তি ফিরে এলে ডুয়ার্সকে পর্যটকরা পাহাড়ের সঙ্গে এক-দুরাতের অধিষ্ঠান হিসেবেই ধরে নেয়। এরপরে পর্যটকের স্রোত এবং কিছু বেসরকারি রিসর্ট-হোটেল নির্মাণ দেখা দেয় সে সময়কার জনপ্রিয় কিছু টেলিভিশন অনুষ্ঠান এবং ট্রাভেল

ভুলে গেলে চলবে না ডুয়ার্সের অরণ্যভূমিতে পর্যটকের রমরমা শুরু হয়েছিল মূলত দার্জিলিং পাহাড়ের পথ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার জন্যই। আজ সে পথ ফের উন্মুক্ত অতএব ডুয়ার্সকে ভুগতেই হবে।

ম্যাগাজিনের কৃতিত্বেই। রাজ্যে নতুন সরকারের কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপে এবং দীর্ঘ অশান্তিতে পাহাড়ি মানুষের ধৈর্যচ্যুতি দার্জিলিং হিমালয়ের আপাত শান্তি নিয়ে এসেছে। পর্যটকরা আবার ডুয়ার্স ছেড়ে ভিড় জমাচ্ছে সেই পাহাড়েই। এ রাজ্যের 'প্রতিভাবান' পর্যটন কর্তাদের একটি তথ্য নিয়ে খানিকটা হলেও উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত—গত তিন বছরে ডুয়ার্সের পর্যটক আগমনের সংখ্যা কিন্তু নিম্নমুখী। গরুমারা ও জলদাপাড়াতে চিত্র একই। সরকারি লজের পরিসংখ্যান দিয়ে সমগ্র ডুয়ার্সের আসল চিত্র যে বোঝা সম্ভব নয় সে তো একটি সদ্য জ্ঞান হওয়া কিশোরেরও অনুভব করার কথা।

তাহলে এঁরা আসলে কী করতে চাইছেন? একজন বিদেশি টুরিস্টকে রয়ালবেঙ্গল বা বৃহত্তম বাদাবনের রূপ দেখাতে সুন্দরবন কিংবা কাঞ্চনজঙ্ঘা-টয়ট্রেন-চা বাগান দেখাতে দার্জিলিং টেনে আনা গেলেও যেতে পারে কিন্তু সে ডুয়ার্সে কেন আসতে চাইবে বলুন তো! চা বাগান-নদী-পাহাড়ের মিশ্র ল্যান্ডস্কেপ আর গুটিকতক গন্ডারের প্যাকেজ এখনও দেশের অন্যান্য রাজ্যের লোকের কাছেই আজ পর্যন্ত ঠিকমত বিক্রি করতে পারলাম না তো বিদেশি টুরিস্ট তো অনেক দূরের কথা!

সেই সব 'আশ্চর্যমানব' পর্যটন কর্তারা বরং এই শীতের মরসুমে নিজেরাই যদি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বা গন্ডারের কিংবা ছৌ মুখোশ পরে কিছু বা রবিঠাকুর-বিবেকানন্দ-নেতাজী সুভাষ সেজে দিল্লি-মুম্বই-ব্যাঙ্গালোর-হায়দ্রাবাদ-আমেদাবাদের রাজপথে লম্ফঝম্প করেন তবে কিছু টুরিস্ট কিঞ্চিৎ উৎসাহী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এলেও আসতে পারেন। যদিও একই সঙ্গে তাঁদের কঠিন দায়িত্ব, ভিনরাজ্যের মানুষকে আশ্বস্ত করতে হবে রাজ্যের প্রশাসনিক শান্তি-নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো নিয়ে। আর এখন ডুয়ার্সকে পুনরায় চাঙ্গা করে তুলতে গেলে চাই পিওর দিশি টুরিস্ট, যারা সীমিত সাধ্যের ছুটি কাটাতে তিন-চারদিনের জন্য ডুয়ার্সে ছুটে আসবেন।

স্বরূপ রায়

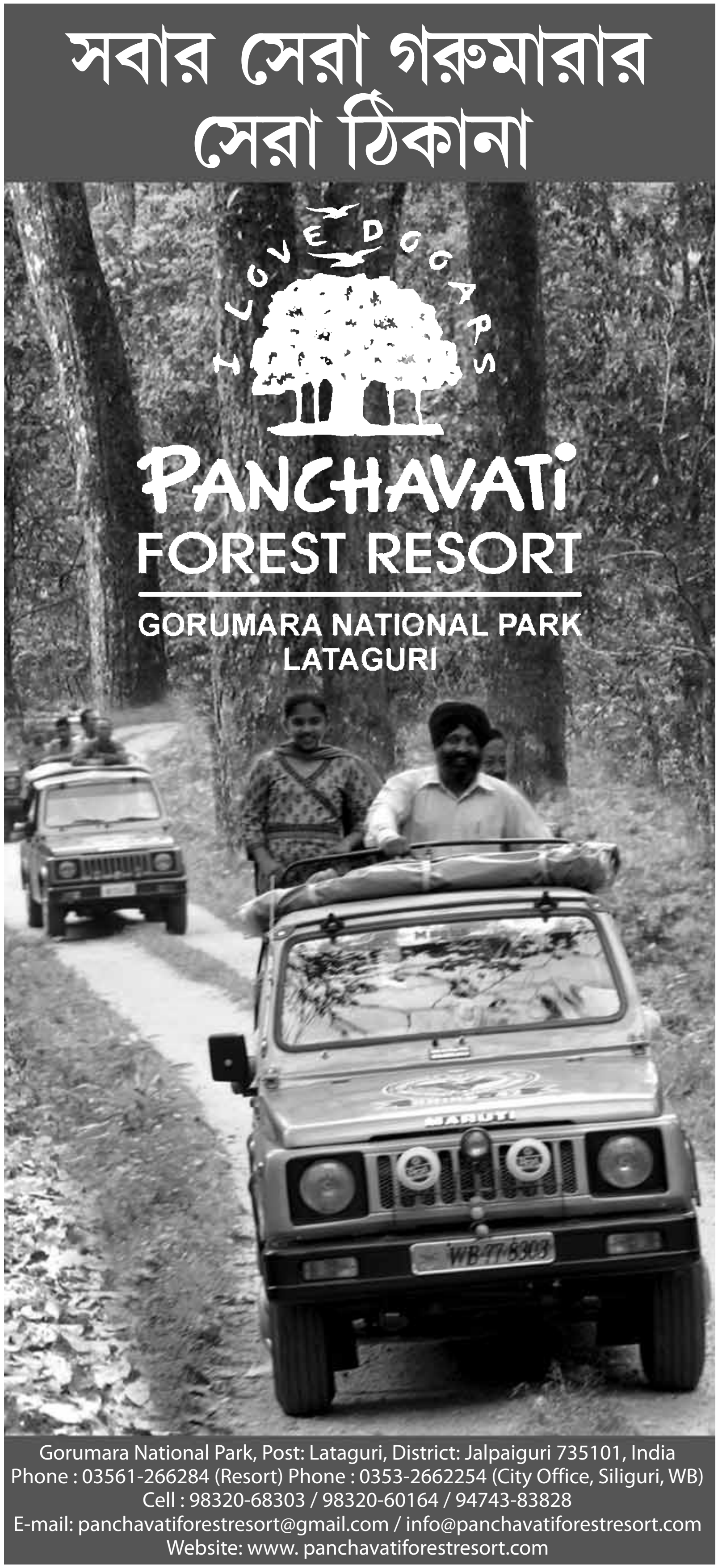

কোচবিহার রাসমেলা

আজও মানুষের হৃদয় জুড়ে

কোচবিহার, ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের মানুষ শতাব্দী প্রাচীন এই মিলন মেলায় মিলিত হওয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আজও অনুসরণ করে চলেছেন। এই আবেগকে আজও কেউ মুছে দিতে পারেনি, সেই আবেগই এখানকার মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ। এই মেলার স্বাতন্ত্র্য এখানেই। তবু আজ একটি বড় প্রশ্ন অবধারিতভাবে উঠে আসে, যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা বলছি, সেই ঐতিহ্য কি ধরে রাখা যাচ্ছে এখনও ?

মদনমোহন ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই কোচবিহারের রাসমেলা। এই মদনমোহন ঠাকুরই কোচ-রাজবংশের অধিদেবতা। ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, পূর্বে ঠাকুরবাড়ি ছিল বর্তমান ভবানী সিনেমা হলের কাছাকাছি 'পুরাণ আবাসে'ই। পরবর্তী সময়ে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রাসমেলা শুরু হয়েছিল মদনমোহন মন্দিরের পাশেই। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বৈরাগী দিঘির পাশে এই মন্দিরটি স্থাপিত হবার পর ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ৪ মে রাজবাড়ির সিংহদ্বার থেকে মদনমোহন ঠাকুরকে তুলে এনে এখানেই পূজা-অর্চনার মাধ্যমে মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ নিজে উপস্থিত থেকে এই মদনমোহন ঠাকুরের উদ্বোধনকার্য সমাধা করেন।

এর অনেক আগে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে 'পুরাণ আবাস'-এ কিছুদিন বসবাসের পর ভূতের উপদ্রব হওয়ায় মহারাজা তাঁর রাজধানী ভেটাগুড়িতে স্থানান্তরিত করেন। এই দিনটি ছিল রাস পূর্ণিমার মহা পূণ্য দিবস। এই পূজা উপলক্ষে সেখানেও রাস যাত্রা মেলায় পরিণত হয়। জানা যায়, এই রাসেও মনুষ্য সমাগম চলে কয়েকদিন ধরে। এখানেও ভূতের উপদ্রব হওয়ায় মহারাজা উপেন্দ্র নারায়ণের তৈরি ধলিয়াবাড়িতে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। কিছুদিন থাকার পর এখানেও যখন ভূতের উপদ্রব শুরু হয় তখন উপায়ান্তর না পেয়ে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ 'পুরাণ আবাস'-এই (বিহার দুর্গে) ফিরে আসেন।

রাসমেলার উদ্বোধনে মহারাজারা নিজে উপস্থিত থেকে বিশেষ পূজা এবং হোমযজ্ঞের

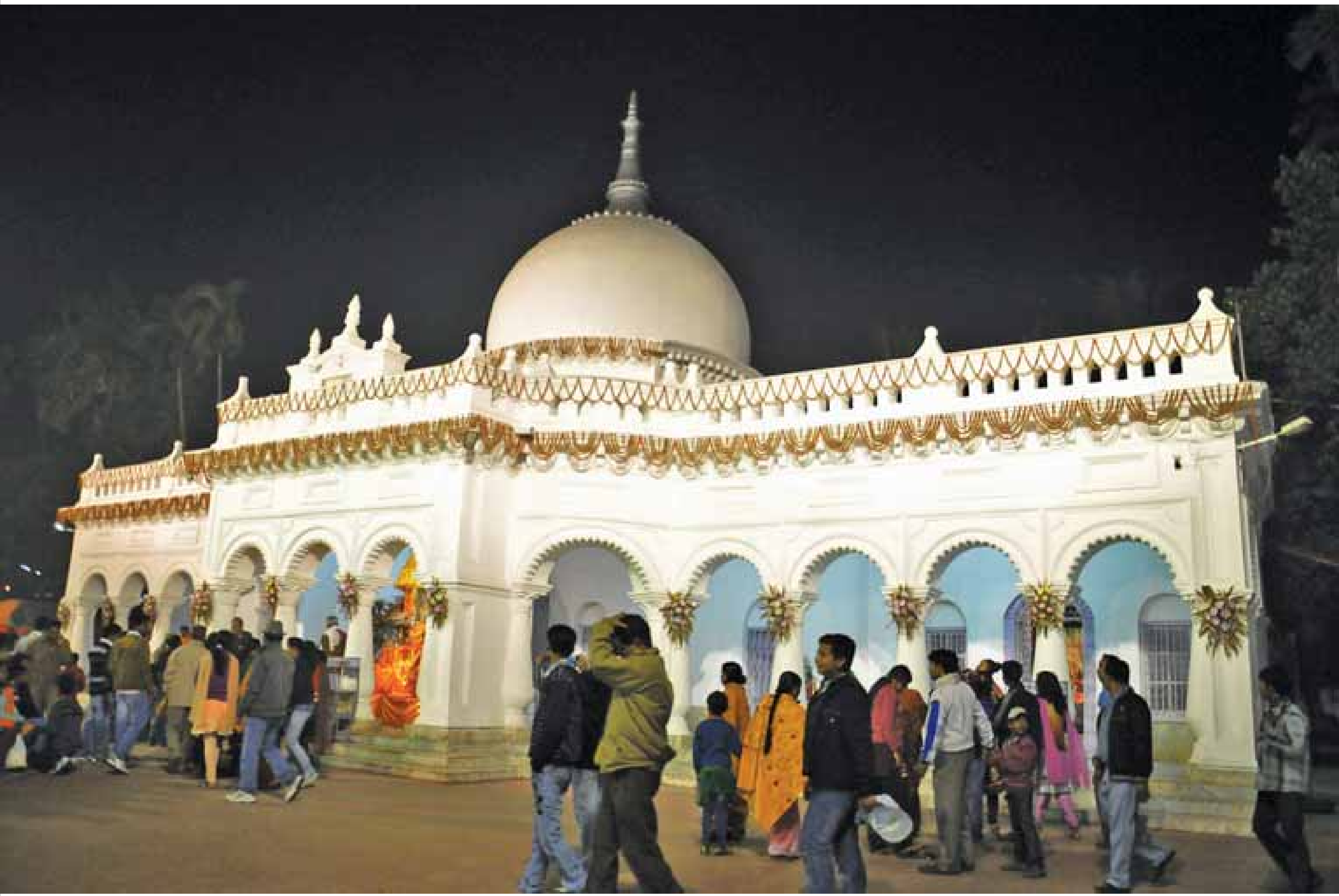

কোচবিহার মদনমোহন মন্দির চত্বরে রাসমেলার সন্ধ্যায়

মাধ্যমে রাসমেলার উদ্বোধন করতেন। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি রাসমেলা চলতো মাত্র ৭ দিন, তার আগে চলতো ৩ দিন। এখন চলে ১৫/১৬ দিন ধরে। আগে মেলা বসতো বৈরাগী দিঘির চারপাশে, রাস্তার দু'দিকে হতো দোকানের সারি। মেলার আকর্ষণ যতই বাড়তে থাকে, ততই পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষজন আসতে থাকে। জায়গার প্রয়োজনে মেলার আয়তনও ক্রমশই বাড়তে থাকে। পরবর্তীকালে বাধ্য হয়ে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মদনমোহন বাড়ির সন্নিকটে পূর্বদিকে 'প্যারেড গ্রাউন্ড' নামে এক বিশাল মাঠ মেলার জন্য নির্দ্ধারিত হয়। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত রাসমেলা সেখানেই হয়ে আসছে। চিরাচিরিত প্রথা মতো রাস পূর্ণিমায় এই মেলার উদ্বোধন হয় এবং ১৫/১৬ দিন পর্যন্ত এই মেলা চলে। কোচবিহারের ধর্মপ্রাণ মহারাজা ঠাকুরবাড়ির রাস মঞ্চের পূজা সমাপনান্তে এই মেলার উদ্বোধন করতেন, এখন সেই মেলার উদ্বোধন করেন জেলা শাসক কিংবা কোচবিহারের জেলা জজ।

যে মদনমোহন বিগ্রহকে কেন্দ্র করে এই মেলার শুরু, সেই মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গনের প্রবেশ পথে তোরণদ্বার। তোরণদ্বারের ওপরে নহবৎ খানা। এই তোরণদ্বারের দুই দিকে রক্ষকদের থাকার জায়গা। এখন সেখানে দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের অফিস। সম্মুখের রাস্তার দুই পার্শ্বে পাম গাছের সারি, সামনে বিরাট দিঘি। শিশির ঝরা সকালে রাস্তা জুড়ে পামের সাদা ছোট ছোট ফুল যখন ঝরে পড়ে, আপ্লুত করে ভক্তপ্রাণ মানুষের মন তখন সেই মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে দেবালয়ের দিকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে ওই পবিত্রভূমি অতিক্রম কি করা যায়! যায় না। দেবালয়ের বুঝি এটাই মাহাত্ম। দেবাঙ্গনের স্পর্শেই বুঝি মানুষ পবিত্র হয়ে যায়, এক নতুন স্পর্শানুভূতিতেই মানুষ ভুলে যায় সুখ দুঃখ বেদনার নানা জটিল কথা-কাহিনী। কী পেলাম, কিংবা কে একজন আছেন, যিনি দুহাত উজার করে দেবার জন্যেই আছেন। কিন্তু আমরাই কি নিতে পারি! নিজেকে অসহায় মনে হয়, দুহাত তুলে নিজের সেই দুর্বলতম অংশটুকু এই দেবাঙ্গনে সমর্পণ করতে লজ্জা কি। সাহস ও কর্মক্ষমতা অর্জন করতে, কিংবা অর্জন করার প্রেরণায় মদনমোহনের এই পূর্ণ্যময় রাসমেলায় তাই এত লক্ষ মানুষের ঢল। বহু আগে এই মেলায় পুণ্যার্থীরা, ব্যবসায়ীরা, দর্শনার্থীরা আসতো

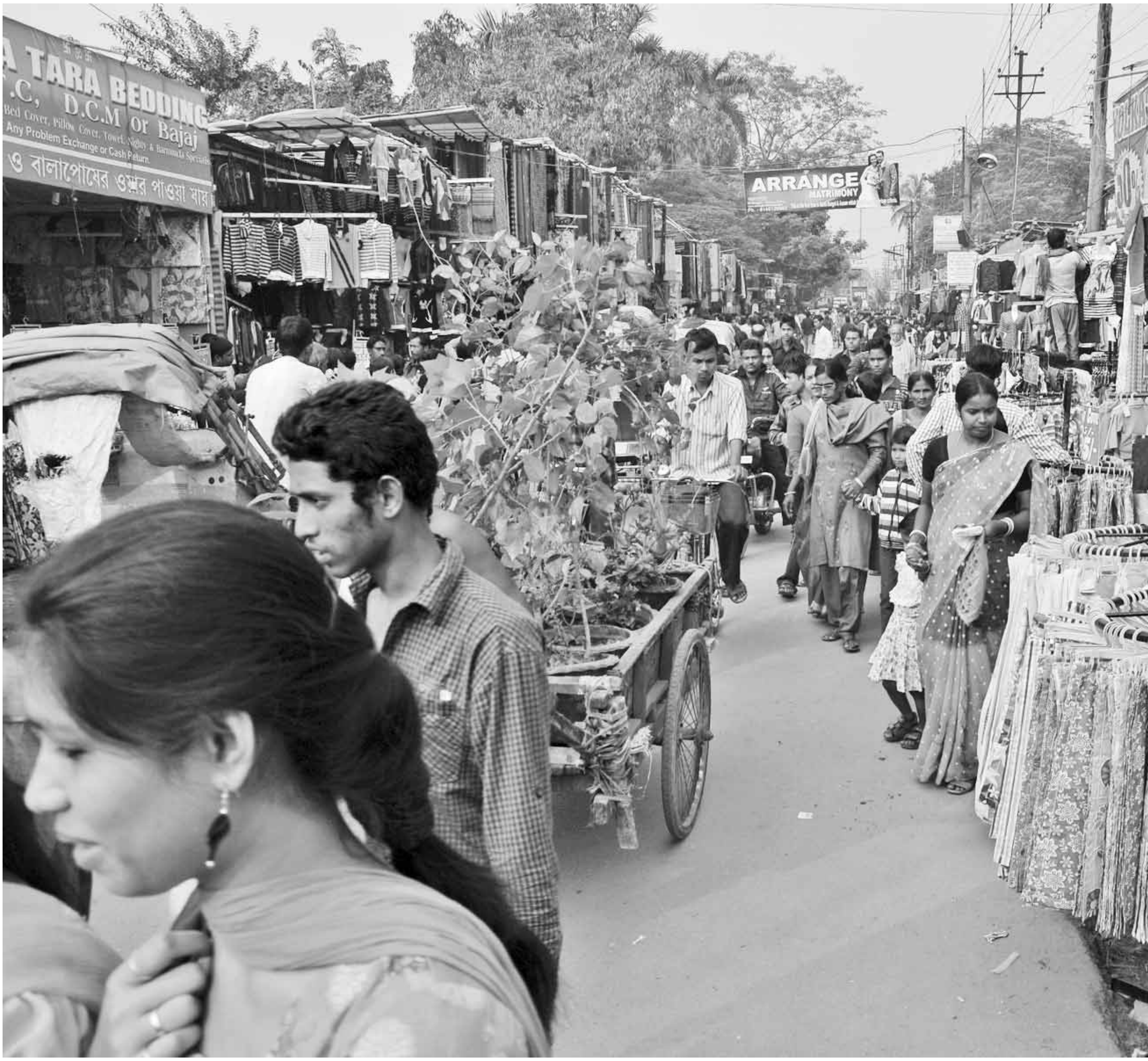

১৫ দিন ব্যাপী এই মেলায় দিনের বেলায় দখল নেয় বহিরাগতরা, সন্ধের পর বেড়াতে আসে শহরের মানুষ

পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) রংপুর, লালমণির হাট, ভুটান, আসাম এবং কলকাতা থেকে। প্রাচীনকালে কোচবিহার আসাম ছিল কামতারাজ্যের অধীন। শাসনভার ছিল কোচবিহারের মহারাজার ওপর। এই ক্ষমতা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ময়মন সিংহের কিয়দংশ ও রংপুর জেলা। এই কারণে পরবর্তীতেও এই কোচবিহারের রাসমেলাকে কেন্দ্র করে এই সকল অঞ্চলের মানুষেরা একত্রি হবার প্রেরণা পেতেন। শুধু সংহতির বা ঐক্যের জন্যেই নয়, এই রাসমেলা এই এলাকার মানুষের সহজ সরল অনাবিল ভাবাবেগে আপ্লুত। যাঁকে উপলক্ষ্য করে এই রাসমেলা, সেই দেবতা তিনি, যিনি বিপদে উদ্ধারকর্তা, প্রেমে দয়িত, সুখে অধীশ্বর, দুঃখে প্রশমণকর্তা, তিনিই এখানকার সমাজজীবনকে নিজের স্নেহ প্রীতি রসে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছেন। এ ভাবেই উত্তরবঙ্গের মানুষ এই মিলন মেলায় মিলিত হওয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আজও অনুসরণ করে চলেছেন। এই আবেগকে আজও কেউ মুছে দিতে পারেনি, সেই আবেগই এখানকার মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ। এই মেলার স্বাতন্ত্র্য এখানেই। বিপদে স্ত্রী যেমন স্বামীকে স্মরণ করেন, পুত্র পিতাকে, ভাই ভ্রাতাকে, তেমনই এখানকার মানুষের মধ্যে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, চেতনা, দয়া, মায়া-স্নেহ-মমতা, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতির মূর্ত প্রকাশ এই মদনমোহনকে ঘিরেই, এই মদনমোহনের রাসমেলাকে নিয়েই। অর্থ যশ দ্বেষ প্রভৃতি মদনমোহনের কাছে পরাভূত। নিত্য নতুন চিন্তার ফসল মদনমোহন যেন পথ চলার পাথেয়ও। কাজের প্রেরণা, চলার শক্তি, চিন্তার খোরাক নিয়ে ঘরের ঠাকুর মদনমোহন সবার প্রাণের ঠাকুর হয়ে উঠেছেন। যতই দিন যাচ্ছে, ততই এই পরিবর্তনটা ঘটছে ভক্তপ্রাণ মানুষের মধ্যে।

মদনমোহন এখন আর মানুষের দেখা বিগ্রহ নয়, মদনমোহন অনুভবের অভিব্যক্তি, এখানকার মানুষের প্রাণের আনন্দ। তাই তো এই ১৫ দিনের রাসমেলা, এই রাসমেলাই প্রাণভোমরা হয়ে উঠেছে সম্মিলিত মানুষের ভক্তিরস সিঞ্চনে। যেন বা জীবনে আর কোনও নতুন আশা নেই, যথেচ্ছ কামনা নেই, অদম্য স্পৃহা নেই, খ্যাতির শীর্ষে ওঠার অক্লান্ত পরিশ্রম নেই, শুধু আছে নিবিড় ভালবাসা, ভক্তি শ্রদ্ধা, মানুষকে নিজের মতো করে ভাববার অদম্য প্রেরণা।

মদনমোহন এখন আর মানুষের দেখা বিগ্রহ নয়, মদনমোহন অনুভবের অভিব্যক্তি, এখানকার মানুষের প্রাণের আনন্দ। তাই তো এই ১৫ দিনের রাসমেলা, এই রাসমেলাই প্রাণভোমরা হয়ে উঠেছে সম্মিলিত মানুষের ভক্তিরস সিঞ্চনে। যেন বা জীবনে আর কোনও নতুন আশা নেই, যথেচ্ছ কামনা নেই, অদম্য স্পৃহা নেই, খ্যাতির শীর্ষে ওঠার অক্লান্ত পরিশ্রম নেই, শুধু আছে নিবিড় ভালবাসা, ভক্তি শ্রদ্ধা, মানুষকে নিজের মতো করে ভাববার অদম্য প্রেরণা। এই কারণেই প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনকে শ্রদ্ধা-ভক্তির আসন থেকে কেউ দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি। এখানকার মানুষের তাই রাসমেলার দিনগুলিতে অগ্রহায়ণের নতুন ধান কেটে মুখের অন্ন বিক্রি করেও একবার দূর-দূরান্ত থেকে রাসমেলা ঘুরে দেখতে আশা চাই-ই। এই সঙ্গে একবার ঠাকুরকে চোখে দেখা, রাসের মিলন মেলায় মিলিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করা। এভাবেই রাসমেলা মিলন মেলায় উপনীত হয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুসরণ করে যাচ্ছে। এই কটা দিন বর্তমান সমাজজীবনের পঙ্কিল আবর্ত থেকে মুক্ত থাকার অনুপ্রেরণাও হয়তো।

এখানে একটি বড় প্রশ্ন অবধারিতভাবে উঠে আসে, যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা বলছি, সেই ঐতিহ্য কি ধরে রাখা যাচ্ছে এখনও? কী জানি, যদি তাই হতো, তবে আগের মতো স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? এই ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা উপলক্ষ্যে যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশেষ সরকারি বাসের ব্যবস্থা নেই কেন? রাসমেলা উপলক্ষ্যে রাত কাটানো ভক্তদের জন্য রাজ আমলে নির্মিত আনন্দময়ী ধর্মশালা এখন গেস্ট হাউসে পরিণত হলো কেন? এই দেবালয় থেকে প্রচুর আয় হওয়া সত্ত্বেও কেন আজ প্রশাসনকে অর্থের পিছনে ছুটতে হচ্ছে? মানুষের আবেগ, ভালবাসা, ভক্তির আর আর কি কোনও দামই নেই? রাজ আমলে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এযুগের গণতন্ত্রে নির্বাচিত সরকার ও প্রশাসন মানছেন না কেন, এই প্রশ্নও আজ উঠতে শুরু করেছে। একশত চব্বিশ বছরের ইতিহাসের উজ্জ্বলতা ফিকে হবে কেন, এ প্রশ্নও কুরে কুরে খায়।

মনে পড়ে সেই ছোটবেলার কথা। তখন আমার বয়সই বা কত! পনেরো মাইল দূরের গ্রাম থেকে এই রাসমেলা দেখতে এসেছি ছই দেওয়া গোরুর গাড়িতে চড়ে। গোরুর গলায় বাঁধা থাকতো ঘণ্টা। গাড়ি যখন চলতো, তখন সেই ঘণ্টার মধুরতম ধ্বনি একনাগাড়ে বাজতেই থাকতো। দুপাশের জঙ্গল, বড় বড় শালগাছ, মাঝেমধ্যে জরাজীর্ণ দু-একটা বাড়ি পেরিয়ে যখন আমরা রাসমেলায় পৌঁছতাম, তখন মনের কোণে চিক চিক করে জ্বলে ওঠা আনন্দ জোয়ারে ভেসে বেড়াতাম। পরিবারের সকলে মিলে রাসমেলা দেখতে যাওয়াটাই ছিল ছোটবেলার অনাবিল অপার আনন্দ। ধান পাট বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যেত, সেই টাকায় গরম জামা কাপড় কেনা, সার্কাস দেখা, আরও কত কি! গোরুর গাড়ি এসে থামতো বর্তমান আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের সম্মুখে রাস্তার ধারে। দেখতাম, সেখানে সারিবদ্ধভাবে ছই দেওয়া গোরুর গাড়ি এসে থেমেছে। গোরুগুলি বাড়ি থেকে নিয়ে আসা খড় চিবোচ্ছে। সেই সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। গোরুগুলি যখন এদিক ওদিকে ঘাড় নাড়াচ্ছে, আর অমনি বেজে উঠছে টুং টাং ঘণ্টাধ্বনি। এইভাবে সারিবদ্ধ গোরুর গলার ঘণ্টাধ্বনি টুং টাং বেজেই চলেছে। এই মধুর ধ্বনি যেন এক মোহময় পরিবেশ রচনা করেই চলতো। কোনও এক অজান্তেই এই মধুরতম ধ্বনি রাসমেলাকে আরও ছন্দময় নিবিড় আনন্দময় করে তুলছে। কোনও এক অজানার পথ বেয়ে দর্শনার্থীদের কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে উপরি পাওনা হিসেবে। মনে পড়ে, মন্দির প্রাঙ্গনে বিরাট সামিয়ানা টাঙিয়ে সারারাত চলতো পালাগান, কীর্তন, যাত্রা প্রভৃতি আনন্দ অনুষ্ঠান। শ্রোতাদের জন্য থাকতো খড় বিছানো বসার জায়গা। যাত্রা দেখতে দেখতে বা পালা গান শুনতে শুনতে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তাম। এইভাবে রাত কাটানোর পর ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে ফের মেলায় চলে যেতাম। মেলার পূর্ব পার্শ্বে বসতো সারি সারি দই চিড়ার দোকান। সেই দোকানে সকালে দই-চিড়া খাওয়া হতো গুড় দিয়ে, সঙ্গে হয়তো

স্থানীয় গ্রামীণ লোকশিল্পের পশরা বসে রাসমেলায়, দুঃস্থ শিল্পীদের খানিকটা হলেও সংস্থান হয় এই মেলায়। তা সে কাঠের খেলনা বা শীতলপাটি কিংবা বাঁশের টমটম গাড়ি বা বাঁশি যাই হোক, আজও গ্রামীণ শিল্পীদের হাতের কাজের সমান কদর হয় ঐতিহ্যমণ্ডিত এই মেলায়। আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যের ভিড়ে আজও যে শিল্প হারিয়ে যায়নি, তার কৃতিত্ব এই রাসমেলার।

জুটতো একটা রসগোল্লাও। কী আনন্দভরেই না খাওয়া হতো। এখন বসে লুচি-তরকারি। চায়ের দোকান। মনে পড়ে এক পয়সা দিয়ে জিলিপি পাওয়া যেত। মদনমোহন মন্দিরের পাশেই থাকতো মাটির তৈরি বৃহৎ আকারের পুতনা রাক্ষসী। এখন অবশ্য আর সেই বৃহৎ আকারের পুতনা তৈরিই হয় না। রাসমঞ্চ সাতপাক ঘুরলে মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়, হাতে নাগাল পেতাম না, সে কারণে দিদিমার কোলে উঠে রাসমঞ্চ ঘুরিয়ে দিতাম। এই রাসমেলার সঙ্গে ছিল আর একটি বাড়তি আকর্ষণ, সেটি হচ্ছে যাঁরা রাসমেলা ঘুরতে আসছেন তাঁরা সকলেই একবার অবশ্যই রাজবাড়ি দেখতে যেতেন। এখানকার সাধারণ মানুষেরা ছিল মহারাজ-অন্ত প্রাণ। তাই রাজবাড়িতেও এই মেলার কটা দিন ভিড় উপছে পড়তো। দিন যত যাচ্ছে আকর্ষণ তত কমে যাচ্ছে, আবেগ-আনন্দ অনেকটাই কৃত্রিমতায় ভরে

রাসমেলা মানেই কোচবিহার জেলার প্রাচীন সব দিশি মিঠাইয়ের মেলা। কদমা, বাদাম তক্তি, নকুরদানা এবং সবার উপরে রয়েছে ভেটাগুড়ির বিখ্যাত জিলিপি। আজকের ফিসফ্রাই-কাটলেট কিংবা চাইনিজ জৌলুসের পাশাপাশি দেদার বিকোয় দিশি মিঠাই। গ্রামের মানুষ তো বটেই শহরের আধুনিক প্রজন্মও যথেষ্ট তারিফ করে এইসব প্রায় হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যের।

যাচ্ছে। এখন মেলায় যারা যায় তাদের বেশির ভাগই চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায়, বিরিয়ানি কাটলেট খায়। প্রশাসনিক ব্যবস্থা কঠোরতম হওয়া সত্ত্বেও চুরি-ডাকাতি ছিনতাই লেগেই আছে। তিন মাস আগে থেকে রাসমেলা আসছে এই আনন্দে মেতে থাকার মোহময়তা কম ছিল না। যতই দিন যাচ্ছে ততই উন্নত সভ্যতার কৃত্রিমতার নিষ্পেষণে মনের অলিন্দের সেই স্বচ্ছ সুখানুভূতিগুলি যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবুও যতটুকুই হোক এখনও এই কোচবিহারের রাসমেলা বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষের মনের অনাবিল আনন্দ ও সুখানুভূতি। তাই এখনও একে ঘিরে চলে সুখ-দুঃখের তুল্য বিচার বিশ্লেষণ।

রণজিৎ দেব

ছবি : সাত্যকি বিশ্বাস

চোরাশিকারির প্রত্যাবর্তন !
সীলমোহর লাগাল গরুমারা

জলদাপাড়ার পর এবার গরুমারা। বনরক্ষার নির্লজ্জ উদাহরণ আর একবার রাজ্যের মানুষের সামনে প্রকট হল। যেখানে রাজ্য বনদপ্তরের প্রধানের পদটি আশ্চর্যজনকভাবে শূন্য পড়ে থাকে কিংবা যেখানে অরণ্য রক্ষার আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা দিনের পর দিন অচল, সেখানে এর চাইতে বেশি কিছু আশা করাটাই অন্যায়। বনদপ্তরের বড় কর্তাদের অবশ্য এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে জবাবদিহি করতে বয়েই গেছে।

খবরটা পড়ে বছর কয়েক আগের কথা মনে পড়ছিল। সেবার দেশের সেরা জাতীয় উদ্যানের শিরোপা পেয়েছিল গরুমারা। গর্বে গোটা ডুয়ার্সের বুক ফুলে উঠেছিল সেদিন, গর্বিত হাসি ছিল গরুমারার বনকর্মীদের ঠোঁটে। সত্যি কথা বলতে গাছকাটা বা চোরাশিকার দীর্ঘ দুই দশকের মতো সময় ধরে বিদায় নিয়েছিল গরুমারার জঙ্গল থেকে। কিন্তু চিরদিন তো সমান নাহি যায়। বিচ্যুতির লক্ষণ যে ইদানীং ধরা পড়ছিল না তা নয়, প্রশাসনের মুঠো যে ক্রমশ আলগা হচ্ছিল সে ইঙ্গিতও মিলেছিল স্থানীয় মানুষদের আচরণে।

বক্সার জঙ্গলে বেআইনি গাছকাটা বা চোরাশিকারের টুকটাক খবর তো লেগেই থাকে। বরং সেখানে যথাযথ ইকোটুরিজমের প্রসার ঘটলে যে তা একরকম নজরদারিরই সামিল হত সেই সত্যি কখনই বুঝতে বা মেনে নিতে চাননি এই 'টাইগার' রিজার্ভের কেষ্টবিষ্টুরা। দুর্নীতি কিংবা নিজেদের অহং কায়েম রাখতেই বোধহয় এই টাইগার রিজার্ভ প্রশাসনের একটা অংশকে আগাগোড়াই দেখা গেছে ইকো পর্যটনের বিরোধিতা করতে। নেহাতই স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিদের চাপ থাকে, তাই মাঝে মধ্যে মরশুমে পর্যটকদের জন্য খুলে দিতে হয় জঙ্গলের কিছু রাস্তা।

চিলাপাতা-মেন্দাবাড়ির জঙ্গল তো তুলনায় অনেকটাই অরক্ষিত, সেখানেও বন্যপ্রাণ যথেষ্ট পরিমাণে মেলে। জলদাপাড়া 'ন্যাশনাল পার্ক' ঘোষণা হওয়ার পর আশা

গোরুমারায় উদ্ধার গন্ডারের পচাগলা দেহ, উধাও খড়গ

করা হয়েছিল এসব এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ বা সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে অহরহ নজরদারি, রাজ্যে গাড়ি চলাচলে নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বাড়বে। চাকচিক্য বাড়ানোর টাকা হয়ত বনদপ্তরের এই মুহূর্তে নেই, কিন্তু ন্যাশনাল পার্কের বিধিনিষেধ কার্যকর হলে তো তা অবশ্যই চোখে পড়বে। জলদাপাড়া জঙ্গলের একটা দিক তো আগাগোড়াই খোলামেলা। বিট অফিসারদের সঙ্গে খাতির থাকলে অবাধে জঙ্গলে যখন তখন ঢুকে পড়া যায়। সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে বন সংরক্ষণের সচেতনতা বাড়ানো নিয়ে এখনও কোনও কার্যকলাপ শুরু হয়নি। বরং নানা ইস্যুতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বনদপ্তরের সংঘাত জলদাপাড়ার নিত্য ঘটনা, খবরের কাগজে নিয়মিত চোখ রাখলেই তার আন্দাজ মেলে। কখনও হরিণ মেরে বনভোজন নিয়ে বা কখনও গবাদিপশু হারিয়ে যাওয়া নিয়ে উত্তপ্ত আবহাওয়া, কখনও বা জনরোষেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বনবাংলো। আর গ্রামবাসীকে উত্যক্ত করার জন্য স্বার্থান্বেষী মুরুব্বিদের কখনই অভাব হয় না। আর সেই সুযোগ নিয়েই ঢুকে পড়ে চোরাশিকারির দল।

জলদাপাড়ার জঙ্গলে চোরাশিকারির হাতে সম্প্রতি পরপর চারটি গন্ডার নিধনে দেশের সমগ্র বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ মহল চমকে উঠলেও বনকর্তাদের খুব একটা হেলদোল হয়েছে বলে মনে হয় না। দায়িত্বে গাফিলতি স্বীকার তো অনেক দূরের কথা, নিজেদের পশ্চাদ্দেশ বাঁচাতে কিছু নির্লজ্জ হাস্যকর অজুহাত খাড়া করেই তখনকার মতো অব্যাহতি মিলেছে তাদের। কোনও এক মাঝারি অফিসারকে বলির পাঁঠা করে বদলি করা হল, শাস্তি বলতে এইটুকুই।

কিন্তু আত্মম্ভরিতায় মশগুল সেইসব বনকর্তারা তখন বুঝতেই পারেননি, চোরাশিকারিরা এবার সদর দপ্তরেই কামান দাগবেন। গরুমারার মতো ছোট্ট এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে ঢুকে ধীরেসুস্থে চিড়েভাজা চিবুতে চিবুতে একটা আস্ত গন্ডারকে নিঃশব্দে হত্যা করে তার খড়গ কেটে নিয়ে চলে গেল দুষ্কৃতীরা। নিন্দুকের অভিমত, বড় সাহেবরা তখনই হয়তো কাছাকাছি কোনও বনবাংলোয় সোফায় বসে সান্ধ্যকালীন আড্ডায় মগ্ন

ছিলেন, আর তাদের দেখভালের জন্য শশব্যস্ত মাঝারি ও ছোট অফিসাররা, যাদের আসলে থাকার কথা বন্যপ্রাণ পাহারায়। এর বহু পরে, তাঁরা সবাই যখন টের পেলেন ততদিনে গন্ডারের সেই মৃতদেহ পচতে শুরু করেছে। সেই পচা গন্ধে টনক নড়েছে তাঁদের। মূল্যবান খড়গ ততদিনে পৌঁছে গেছে বহুদূর, আর সেইসব চোরাশিকারিরা হয়ত কাছেপিঠেই কোথাও নির্বিঘ্নে ওত পেতে রয়েছে। ব্যস ক'টা দিন, মিডিয়া চুপ হয়ে গেলেই জঙ্গল ফিরে আসবে আগের অভ্যেসে। তখনই শুরু হবে তাদের পরের অপারেশন।

প্রতিবেশী আসামের কাজিরাঙ্গা জঙ্গলেও হামেশাই চোখে পড়ে গন্ডার নিধনের খবর। কিন্তু চোরাকারবারিদের মতোই সেখানে অত্যন্ত সজাগ ও সক্রিয় সংরক্ষণবাদী সংস্থাগুলি। তাদের অভিযোগের আঙ্গুল সর্বদাই থাকে বনদপ্তরের অসাধু চক্রের দিকে। কিন্তু আমাদের ডুয়ার্সে গন্ডার তো হাতে গোনা। সেই চক্র যদি এখানেও চালু হয়ে যায় তবে ডুয়ার্সের জঙ্গলে গন্ডার অবলুপ্ত হতে খুব বেশিদিন বাকি নেই। এরপর জঙ্গলের বড় সাহেবরা নিয়মমতোই একে একে প্রমোশন পেয়ে অন্যত্র চলে যাবেন। মানুষ বনাম বন্যপ্রাণের এই অসম সংঘাতের অসহায় অদৃষ্টের কথা ভেবে ওপরে বসে কেবল মিটিমিটি হাসবেন ভগবান।

উত্তরায়ণ সমাজদার

বহুদিন ধরেই বন্ধ জঙ্গলের ওয়ারলেস যোগাযোগ ব্যবস্থা

উত্তরবঙ্গে একটি স্থানীয় জনপ্রিয় দৈনিকের পাতায় ২৫ অক্টোবর ২০১৪ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ঃ বনদপ্তরের বিভিন্ন ডিভিশন রেঞ্জ বা বিটের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা, তথ্য আদানপ্রদান করা এবং মূলত চোরাই কার্যকলাপ রোধের উদ্দেশ্যে ২০০৫-৬ সালে বনদফতর ঢাকঢোল পিটিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে রাজ্য জুড়ে চালু করেছিল আধুনিক ওয়ারলেস সিস্টেম। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের ৯০টি রেঞ্জে চালু হয়েছিল এই যোগাযোগ ব্যবস্থা। বিটে বিটে পৃথক পরিকাঠামো তৈরি করে বসানো হয়েছিল ওয়ারলেস মেসিন, বিশাল বিশাল টাওয়ার ও অপারেটিং রুম। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রেঞ্জের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তদারকি চালাবার জন্য জলদাপাড়ার হলং বিটে তৈরি হয়েছিল সেন্ট্রাল অপারেটিং রুম যা নানা বিটের অপারেটিং রুমের সঙ্গে সর্বক্ষণের যোগাযোগ রাখত। যেসব বিটে অপারেটিং রুম করা সম্ভব হয়নি সেগুলির সঙ্গে আশেপাশের বিটের অপারেটিং রুম থেকে যোগাযোগ রাখা হত। বনকর্মীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল বেশ কিছু সংখ্যক ওয়াকিটকি। ডিভিশনাল হেড অফিসে বসেই ডিএফও যে কোনও বিট অফিসের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগযোগ করতে পারতেন তেমনই যে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনার কথা তৎক্ষণাৎ হেড কোয়ার্টার তথা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো সম্ভব হত। জলদাপাড়ার কেন্দ্রীয় অপারেটিং রুম থেকে প্রতিনিয়ত উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানানো যেত কলকাতার রাজ্য সদর দফতরে।

কিন্তু কোনও এক অদৃশ্য কারণে কয়েক বছরের মধ্যে অকেজো হয়ে বন্ধ হয়ে যায় সেই ওয়ারলেস ব্যবস্থা। তার সারাই বা রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও যে কোনওরকম পদক্ষেপ আদৌ নেওয়া হয়নি তা স্পষ্টতই প্রমাণিত সেই সব কন্ট্রোলরুম বা টাওয়ারের বর্তমান হাল দেখে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই গাফিলতি কি ইচ্ছাকৃত? বনাধিকারিকদের কেউ কেউ কি চাননি এইসব আধুনিক যোগাযোগ আদপেই চালু থাকুক যা তাঁদের পক্ষে অস্বস্তিকর? তাঁরা কি তবে মনেপ্রাণে চাইতেন বনাঞ্চলে চলুক তাঁদেরই জঙ্গলের রাজ?

COOCH BEHAR OPG CENTRE

For Modern
Dental & Oral treatment

কোচবিহার
ও.পি.জি সেন্টার

রূপনারায়ণ রোড
(আইস বার শপ ও রাধামাধব শপার্স ওয়ার্ল্ডের পিছনে)
কোচবিহার, মোবাইল ৯৪৭৬৩৬০৯৭৩

DIGITAL OPG DONE HERE BY THE WORLD'S BEST MACHINE

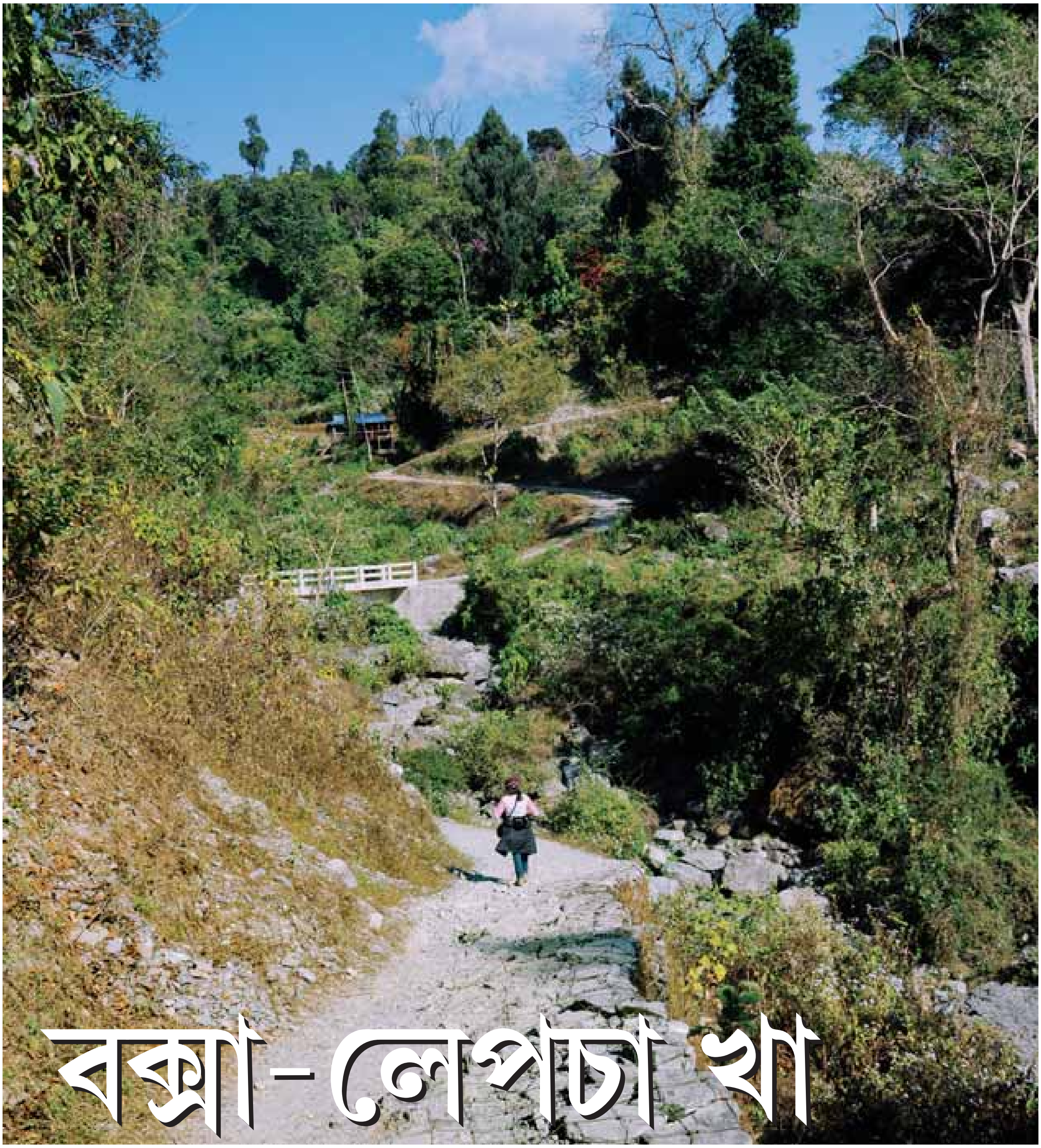

বক্সা-লেপচা খা

‘মেঘের কোলে জেলখানা’ — কবির এই উপমাটা সার্থক। সমতল থেকে এক সময়কার এই কুখ্যাত জেলখানার উচ্চতা মাত্র ২৮৪৪ ফুট হলেও মেঘের ভেলা এখানে যখনতখন পাড়ি দেয়। যদিও আজ এর চেহারা দেখে আর বোঝার উপায় নেই এক সময়ে এখানেই অন্তরীণ ছিলেন পরাধীন ভারতের শাসক ইংরেজদের চোখে ভয়ঙ্কর অপরাধী — মহারাজা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, বীরেশ চ্যাটার্জী, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, জ্ঞান মজুমদার, যতীন রায় প্রমুখ অগ্নিযুগের ভারতমাতার সুসন্তানেরা। এমনকি স্বাধীনতার পরেও অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনি ঘোষণা করে সেই দলের বহু নেতা ও কর্মীকে ভারতরক্ষা আইনে বন্দি করে অন্তরীণ রাখা হয় এই মেঘের কোলের জেলখানায়। অতীতে এই দুর্গ ছিল ভুটান রাজের দখলে। নাম ছিল পাশাখা জঙ। পরে ১৮৬৫ সালে এই দুর্গ ইংরেজদের হাতে আসে। নতুন নাম হয় বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি ব্যারাক। আরও পরে নাম বদলে হয় দুর্গ সংলগ্ন গ্রামের নাম

সামনে তখন সিঞ্চুলা রেঞ্জের উচ্চতম শৃঙ্গ পামসে টপ, আর তার পাশেই আদমা টপের সঙ্গে চলছে মেঘের খেলা। নীল পাহাড়ের মাথাগুলো মাঝে মাঝেই ডুব দিচ্ছে সাদা মেঘের মধ্যে। কত উচ্চতা এই জায়গার? পাঁচ হাজার ফুট? ছয় হাজার ফুট? উঁহু, মাত্র ২৬০০ ফুট। উচ্চতার কৌলিন্য না থাকলেও, সৌন্দর্যে বরফের পাহাড় দেখা যায় না এমন যে কোনও হিমালয়ান হ্যামলেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে লেপচা খা।

অনুসারে বক্সাদুয়ার দুর্গ। আজকের বক্সা দুর্গ। আলিপুরদুয়ার থেকে দমনপুর হয়ে সোজা চলে আসতে হবে রাজাভাতখাওয়া। দূরত্ব মাত্র ১০ কিমি। এখানে জঙ্গলে ঢোকার পারমিট নিয়ে আরও ১৫ কিমি গাড়িতে এসে সান্তালাবাড়ি। এরপর যেতে হবে পায়ে হেঁটে। তবে চওড়া রাস্তা পাওয়া যাবে বক্সাদুয়ারের আগের গ্রাম সদর বাজারের কিছুটা আগে পর্যন্ত। ড্রাইভারের ইচ্ছা হলে এটুকু পথ গাড়িতেই আপনাকে তুলে দিতে পারে। তবে না। সান্তালাবাড়ি থেকে বক্সা দুর্গ অবধি এই সাড়ে তিন কিমি পথ হেঁটে আসার আনন্দ কিন্তু অলাদা। পথ কিন্তু চড়াই। শীতকাল বাদে অন্য সময় আসলে চড়াই ভাঙার থেকেও বেশি কষ্ট পাবেন গরমে। কারণ উচ্চতা কম হবার জন্য পাহাড়ি ঠান্ডা এখানে আশা করবেন না।

আগেই বলেছি বক্সা আগের গ্রাম সদরবাজার। এখানে একটা চা বিরতি নিয়ে নেওয়া যেতেই পারে। চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আবার চলা শুরু করুন। সদরবাজারে ঢোকার মুখেই মেঘে ঢাকা না থাকলে বক্সা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়বে। নীচে থেকে খাড়া উঠে যাওয়া এক পার্বত্য দেওয়ালের উপর ভাঙা পাঁচিল।

সদরবাজার থেকে সামান্য কিছুটা যাবার পরেই দেখা যাবে বিরাট একটা মাঠ। মাঠের উল্টোদিক দিয়ে সোজা উঠে গিয়েছে একটা রাস্তা। দুর্গের দিকে। এই মাঠে সাহেবরা না কি ফুটবল খেলত।

সালটা ১৯৩১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন দার্জিলিং-এ। বক্সা দুর্গের কারাগারে অন্তরীণ বন্দিরা ২৫ শে বৈশাখের দিন কবিকে একটি শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালেন। উত্তরও দেন বিশ্বকবি সেই চিঠির। সেই চিঠি দুটির কথা দুর্গে ঢোকার রাস্তার মুখেই শ্বেত পাথরে খোদাই করা আছে।

দুর্গের ভিতরে ঢুকে বোঝাই যায় না এটা এক সময় ছিল দুর্গ। গেটের সামনেই আছে একটা স্মৃতিস্তম্ভ। বক্সা দুর্গে অন্তরীণ বিপ্লবীদের স্মৃতির উদ্দেশে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে তৈরি করা হয় এই স্মারক।

এরপর সামনে শুধু ইঁট-কাঠ-পাথরের ধ্বংসস্তূপ। বক্সা দুর্গ দেখে ফুটবল মাঠ পেরিয়ে আবার পথে চলে আসুন এবার। এগিয়ে যেতে হবে বক্সাদুয়ার গ্রাম, বক্সা দুর্গকে পিছনে ফেলে সামনের চড়াই পথ ধরে। শুধু চড়াই না উৎরাইও আছে। এঁকেবেঁকে চড়াই-উৎরাই পথ পেরিয়ে ৩ কিমি গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়বে একটা বেশ বড় চোর্তেন। আর কয়েক পা এগিয়ে গেলেই বোঝা যাবে আমাদের আসা পথের শেষ এটাই। ছোট্ট একটা হিলটপ। কয়েকটা কাঠের বাড়ি। চারদিকে ফুল আর ফুল। নতুন লোক দেখে দু-একটা হাড় জিরজিরে কুকুর একটু বিরক্তি প্রকাশ করতেও পারে। তবে ভয়ের কিছু নেই। আসলে এই কুকুরগুলো দিনের বেলাতেই একটু স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে। রাতটা এদের কাছে খুব আতঙ্কের। রাতে প্রায়ই এই লেপচা খা-তে হানা দেয় বক্সা টাইগার রিজার্ভের লেপার্ড।

যাই হোক এরপর আপনাকে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াতেই হবে পাহাড়ের কিনারায়। সামনে তখন সিঞ্চুলা রেঞ্জের উচ্চতম শৃঙ্গ পামসে টপ, আর তার পাশেই আদমা টপের সঙ্গে চলছে মেঘের খেলা। নীল পাহাড়ের মাথাগুলো মাঝে মাঝেই ডুব দিচ্ছে সাদা মেঘের মধ্যে। কত উচ্চতা এই জায়গার? পাঁচ হাজার ফুট? ছয় হাজার ফুট? উঁহু, মাত্র ২৬০০ ফুট। উচ্চতার কৌলিন্য না থাকলেও, সৌন্দর্যে বরফের পাহাড় দেখা যায় না এমন যে কোনও হিমালয়ান হ্যামলেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে লেপচা খা। এবার তাকাতে হবে নীচের দিকে। ওপরে কুয়াশা থাকলেও নীচের আরণ্যক উপত্যকায় তখন হয়তো ঝলমল করবে রোদ। আর তাতে দেখা যাবে ছবিতে দেখা জাপানি গ্রামের মতো রঙিন সব বাড়িঘর।

শুধু তাই না। সঙ্কোশ, রায়ডাক, জয়ন্তি, বালা-সহ যে সাতটা নদী বক্সার জঙ্গলের বুক চিরে চলে গেছে তার সব কটাকেই দেখা যায় এই হিলটপ থেকে। আকাশ খুব পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে সান্তালাবাড়ি এমনকি আলিপুরদুয়ার শহরও দেখা যায়।

ফুল, কুয়াশায় ঢাকা এই ছোট্ট গ্রাম লেপচা খা-কে এবার একটা চক্কোর মেরে এসে বসে পরতেই পারেন পাহাড়ের মাথার সবুজ নরম ঘাসের মখমলে। অসুবিধা থাকলে বেঞ্চও আছে বসার জন্য। সামনে যে লগ হাউসটা দেখবেন ওটাই আপনার রাতের আস্তানা। হোম স্টে সিস্টেম বাড়িটার নাম ছিম। বন্দোবস্ত হোটেলের মতো না হলেও অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষজন, যারা প্রকৃতিকে চান প্রকৃতির মতো করেই, কান পেতে শুনতে চান নিঃশব্দ প্রকৃতির শব্দ—তাঁদের এখানে দু-তিনটে রাত কাটিয়ে দেওয়া কোনও ব্যাপারই না।

লেপচা খা ডুকপা উপজাতিদের গ্রাম। খা শব্দের তিব্বতী অর্থ উপত্যকা। কিন্তু এই গ্রামের সঙ্গে উপত্যকার কী সম্পর্ক ঠিক বোঝা যায় না। কারণ আগেই বলেছি এটা একটা হিলটপ। যাই হোক এবার আপনার ক্লান্ত অবসন্ন শরীর একটু বিশ্রাম চাইবেই। পা দুটো এগিয়ে যেতে চাইবে ছিমের দিকে। বাধা দেবেন না।

ছিমের ঘরগুলো ডুকপা পরিবারটি নিজেদের মতো করে সাজিয়েছে। সব থেকে অবাক হতে হয় জানলাগুলো দেখে। জানলায় কোনও কব্জা সিস্টেম নেই। মিল আছে অনেকটা বাসের জানলার সঙ্গে। ফ্রেশ হয়ে এবার এসে বসে পড়ুন ছিমের চওড়া বারান্দায়। চোখের ওপর ঝুপ ঝুপ করে নামবে আরণ্যক রাত। আর যদি সেই রাত হয় শুক্লপক্ষের — তাহলে তো কথাই নেই। নীলচে সাদা আলোয় পামসে আদমা সহ সমস্ত সিঞ্চুলা রেঞ্জের কালো পাহাড়গুলোর স্নান পর্বটা দেখে নেবার সৌভাগ্য হবে আপনার। এরপর রাত আর একটু ঘন হলে পেট ভরে ভাত অথবা রুটি সঙ্গে দিশি মুরগির ঝোল খেয়ে দিন একটা লম্বা ঘুম। সকালের সাজে লেপচা খা-কে দেখার অপেক্ষায়।

দীপঙ্কর চ্যাটার্জি

ছবি : ডা. প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

ছোটগল্প

বারবাঁক

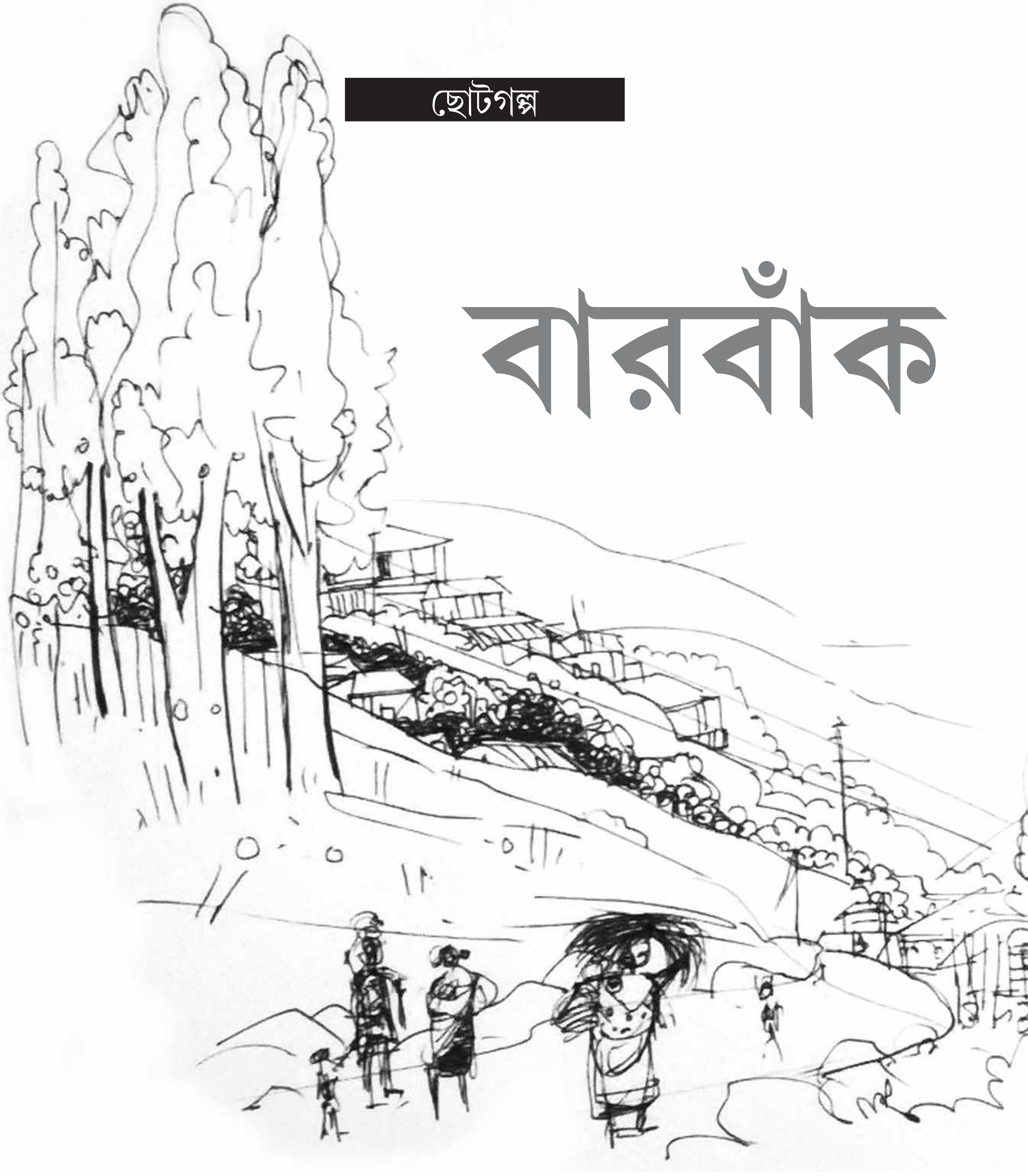

আকাশের মন ভালো করার জন্যই বুঝি শেষ বেলায় একটুখানি রোদ উঠলো। শুধু আকাশ নয় আমারও মনটা ভালো হয়ে গেল। এতক্ষণ কম করে আঠারোবার বাইরে বেরিয়েছি আর পাঁচ মিনিটের মাথায় ঘরে ঢুকেছি। মায়ের কড়া নজর—নো ভেজা। সুতরাং এবারে মনে মনে একটু আহ্লাদিত, কিন্তু মুখটাকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে সবে উঠোনে পা নামিয়েছি, পেছন থেকে হুঙ্কার ধ্বনি বুকের হাড় শুদ্ধ নড়িয়ে দিয়ে গেল। এবারে আর মায়ের নয়, বাবার। আমি প্রায় স্ট্যাচু হয়ে মিনমিন করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম নমিতার সাথে নদীটা একটু দেখে আসি। অনুমতি পাওয়া গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছুট। ছোটবেলায় মাথায় কিছুতেই ঢুকতো না সামান্য বৃষ্টিতেও কী করে বারবাঁকে এত জল আসে। রাতে বৃষ্টি হলেই সকালে দেখতাম দুই তীর ছাপিয়ে জল উপড়ে উঠে এসেছে আর ওই ঘোলা জল বুকে নিয়ে নৃত্য নৃত্য করতে করতে বারবাঁক চলেছে সবাইকে

এরপর রান্থির সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা হতো। ওর অবশ্য আর স্কুলে পড়া হয়নি। বেশিরভাগ দিনই বিকেল বেলায় আমি যখন স্কুল ফিরি ও তখন খগেন হাটের দিকে যায় মাথায় হাড়িয়ার হাড়ি নিয়ে। মুখে সেই মিষ্টি হাসি। একদিন ওকে রাস্তায় ধরলাম। একথা-সেকথার পর জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরে তোর ভয় করে না? অত রাতে সব তো মাতালরাই থাকে হাড়িয়া হাটিতে!' ও সেভাবেই হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'নাঃ, ভয় করবে কেন?

অবাক করে দিয়ে। আসলে পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই বারবাঁক বেশি করে ভরে ওঠে। বাইরে এসে দেখি নদী দেখতে প্রচুর ভিড়। আমরাই শেষ পর্যায়ের দর্শনার্থী। বৃষ্টির মধ্যেই বাকিরা ছাতা মাথায় হাজির হয়েছে। প্রায় সবার হাতেই ছাতা।

নদী দেখতে গেলে তো শুধু নদী নয় গোটা বিশ্বটাও একবার পরিভ্রমণ করে ফেলি। সুতরাং পাকা রাস্তা ধরে চা বাগানের দিকে ছুট দিলাম। এই রাস্তাটা আমাদের খগেনহাট থেকে চা বাগানের পাশ দিয়ে গদিখানায় গিয়ে দু-ভাগ হয়েছে। একটা বীরপাড়ার দিকে গেছে অন্যটা জটেশ্বরে। সারাদিনের বৃষ্টির পর হাল্কা রোদের আলতো আদরে প্রকৃতি যেন রোমাঞ্চিত। চারদিকে পাখির ডাক, গরু-ছাগলের ডাকে সেই ছবি ফুটে উঠেছে। সোনা আলোয় ভিজে মাটি ভিজে গাছ-পালায় অদ্ভুৎ চমক্। আর কি ঘরে থাকা যায়? সারাদিন বন্দী থাকার পর প্রায় সবাই বাইরে বেরিয়েছে। বাবাকেও দেখা যাচ্ছে সাইকেল দাঁড় করিয়ে গল্প করছে ধীরেন কাকার সাথে, হ্যান্ডেলে ঝুলছে ব্যাগ। শনিবার, আজকে হাট নেই। কিন্তু হাটখোলায় এখন প্রতিদিনই বাজারের মতো বসে। চা বাগান অবধি আসতেই দেখলাম রান্থি হাড়িয়া নিয়ে বড় শিরিষ গাছটার নিচে বসে আছে। রান্থি আমার বন্ধু। এক ক্লাসে পড়ি। ফাইভে থাকতেই ওর বাবা মারা গেছে, খুব নেশা করত। রান্থির কাছেই শোনা। একদিন রাতে আর বাড়ি ফেরেনি, রাতে যতটা সম্ভব খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল, পাওয়া যায়নি। পরদিন সকালে দেখা গেছে একটা বড় ড্রেনে ঘাড়-মুখ গুঁজে পড়ে মরে আছে। এসব গল্প রান্থি অবলীলায় বলতো আমাদের। ওর মা বাগানেই কাজ করে। ওকে দেখে মনে পড়লো অনেকদিন স্কুলে আসে না। জিজ্ঞেস করলাম, কিরে স্কুলে যাস্ না কেন? ও হেসে বলল 'যাবো তো যাবো।' আমি অতি উৎসাহী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'কবে থেকে?' রান্থি কিছু বলল না, মুখ নিচু করে হাসলো, পাশে একজন রোগা মতো মহিলা ওরই মতো হাড়িয়া নিয়ে বসেছিল। অবাক হয়ে বলল, 'কেন তুমরা জান না, ওর মা-টা মরে গেছে?' আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। এমন কথা শুনবো মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। দুঃখ দুঃখ মুখ করে তাকালাম ওর দিকে। ও তখনও হাসছে। বলল, 'মা মরে যাওয়ার পর আর স্কুলে যাইনি, তোকে বলাও হয়নি, ইস্কুলে যাব কিছুদিন পরে। ভাইটা বড় হোক, বোনটা বড় হোক।' ওরা এক ভাই, দু-বোন। ওর মায়ের জ্বর হয়েছিল, খুব জ্বর। অনেকদিন ওঠেনি বিছানা থেকে, বাগানে কাজ করেনি। প্রথম দিকে ওষুধ মিলত, পরে টাকাও ফুরিয়ে গেল, ওভাবেই মরে গেল। ওর মায়ের কাজটা ওর কাকার ছেলের হল, এখন নিজের জন্য ভাই-বোনেদের জন্য ও হাটে হাটে হড়িয়া বিক্রি করে। হাট না থাকলে এভাবে রাস্তার পাশে বসে থাকে খরিদ্দারের আশায়। পুরো বিষয়টাই আমার কাছে অপরিচিত। কেননা, জন্ম থেকেই আমি একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ঘেরাটোপে বাস করি। এর বাইরে কখনো নিজের অস্তিত্ব কল্পনাও করিনি।

এরপর রান্থির সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা হতো। ওর অবশ্য আর স্কুলে পড়া হয়নি। বেশিরভাগ দিনই বিকেল বেলায় আমি যখন স্কুল ফিরি ও তখন খগেন হাটের দিকে যায় মাথায় হাড়িয়ার হাড়ি নিয়ে। মুখে সেই মিষ্টি হাসি। একদিন ওকে রাস্তায় ধরলাম। একথা-সেকথার পর জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরে তোর ভয় করে না? অত রাতে সব তো মাতালরাই থাকে হাড়িয়া হাটিতে!' ও সেভাবেই হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'নাঃ, ভয় করবে কেন? ওখানে কেউ কোনও বদ্‌মাশী করতে পারবে না। ওখানে

অনেক নিয়ম কানুন আছে রে।' তারপর আবার তেমনি হেসে বলল, 'নে, এবার ছাড় তো। যেতে দে, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।' তারপরও কতবার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। দেখলেই সেই হাসি। মাথায় হাড়িয়ার হাঁড়ি, পরনে নীল গাউন, হাফ সার্ট, তার উপরে একটা ওড়না জড়ানো সবসময় একটা সুন্দর ছন্দে দ্রুতলয়ে হাঁটে। ছোট ছোট করে পা ফেলে খুব সুন্দর করে দুটো হাতের সঙ্গে সঙ্গে গোটা শরীরটা দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটে। ওরা সবাই প্রায় লাইন করে এভাবেই হাড়িয়া হাটির দিকে যায়। ওরা বিভিন্ন বয়সী আদিবাসী মহিলারা। দেখা হলেই রাম্থি হাসবে, কিন্তু কখনো হাঁটা থামায় না। ওই হাঁটার ছন্দ আর গতির মধ্যে দারুণ একটা বোঝাপড়া আছে, যা আমাদের হাঁটায় আসবে না। মাঝে মাঝে আমারও ইচ্ছে হত ওভাবে ওদের মতো হাড়িয়া মাথায় নিই, পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটি। ওরা যে জায়গাটায় হাড়িয়া বিক্রি করে সেখানকার পরিবেশটাও অন্যরকম। দূর থেকে মনে হয় যেন অন্য কোনও দেশ, অজানা-অচেনা কোনও দ্বীপ, যাকে আমরা এপার থেকে চোখ মেলে দেখতে পারি, অনুভব করতে পারি, কিন্তু কখনোই যেতে পারি না। খগেন হাট, পুরো বাজারটাই আলোকিত। কিন্তু ব্রিজের নীচে হাড়িয়া হাটি, সেখানে কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই। সার সার কুপি জ্বলছে। দূর থেকে কাউকে বোঝা যায় না, চেনা যায় না, শুধু তাদের কল্লোল ভেসে আসে। আমি কখনো হাটে গেলে বারবাঁকের ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করি ওখানে, ওই অদেখা ভিড়ে রাম্থির অস্তিত্ব। আমারই মতো, আমারই বয়সী একটি মেয়ে যেখানে জীবনযুদ্ধে নেমেছে। অনেক রাতে যখন ওদের কুলি কোয়ার্টার থেকে মাদলের শব্দ আর অস্পষ্ট গান ভেসে আসে, আধো ঘুম-আধো চেতনে কল্পনা করি সারাদিনের ক্লান্তি শেষে রাম্থিও সবার সঙ্গে হাতে হাত ধরে পায়ে পা মিলিয়ে নাচছে আর গান করছে।

এরপর মাধ্যমিক পাশ করে ধূপগুড়ি চলে এলাম। উচ্চমাধ্যমিক শেষে কলেজ ও ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ করলাম। তখন ছুটিতে বাড়ি গেলেও আর রাম্থির সাথে দেখা হয়নি। আমি রাম্থিকে প্রায় ভুলেই গেলাম। অবচেতনে অবশ্য থাকলো সে, আমার অগোচরেই।

কিন্তু আবার দেখা হল রাম্থির সঙ্গে। দেখে একেবারে চমকে গেলাম। আমাদের এখানে ভান্ডানী হাটে তিনদিন ধরে ভান্ডানী পুজো ও মেলা হয়। তার মধ্যে একদিন আদিবাসী মেলা। ওইদিন ওদের নাচ ও গানে মেলার মাঠ ভরে ওঠে। সেই ছোটবেলা থেকেই আমরা এই মেলায় আসি। গোটা মাঠ জুড়ে কয়েক জায়গায় নাচের ব্যবস্থা থাকে। মাঝখানে কলাগাছ পুঁতে তার চারপাশে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ছেলেরা-মেয়েরা হাতে হাত ধরে মাদলের তালে তালে নাচে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে। মেয়েরা প্রায় সবাই লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পড়ে, খোঁপায় ফুল, ভীষণ সুন্দর। দলবেঁধে এই তালে তালে নাচের ছন্দে আমাদের পা-ও থেমে থাকতে চায় না। মাদলের ওই দ্রিমি দ্রিমি, আর সমবেত কণ্ঠের গান, বুকের মধ্যে অজান্তেই যেন নেশা ধরিয়ে দেয়। পুজোর সময় এটা আমাদের প্রধান আকর্ষণ। শুধুমাত্র ওই দিনটিতেই দল বেঁধে সাইকেলে করে মেলায় যাই। এবারও এসেছি। সাইকেল রাখার জায়গার পাশেই হাড়িয়া হাটি। হঠাৎ শুনি আমাকে কে ডাকে! আমার সামনেই একজন অত্যন্ত রুগ্ন চেহারার আদিবাসী মহিলা সামনে হাড়িয়ার হাঁড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে। ওই শরীরে অবার পিঠে কাপড়ে বাঁধা একটা বাচ্চা। বাচ্চাটাও ততটাই রুগ্ন, পেটটা ফোলা। শুধু ডাকটা শুনে চিনতে পারলাম রাম্থি। আগের মুখটার কিছু অবশিষ্ট নেই। তার জায়গায় চামড়ায় জড়ানো যেন কঙ্কাল। গর্তের ভেতর দুটো চোখ। তবু হাসিটা আছে। ওটা যেন থাকবেই। থাকতেই হবে। সবাইকে এগিয়ে যেতে বলে আমি থাকলাম রাম্থির সঙ্গে কিছুক্ষণ। ওর কঙ্কাল হয়ে ওঠার গল্প শুনবো বলে। আমি যখন বাইরে, বিয়ে হয়েছিল রাম্থির। বিয়ে হয়ে বারবাঁক লাইনে চলে গেছে শ্বশুর বাড়িতে। ছেলে-মেয়ে হয়েছে চারটে। তারপর বাবার মতো তার বরও মরে গেল অতিরিক্ত নেশা করে। প্রায়ই নেশা করে এখানে-ওখানে পড়ে থাকতো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাড়িয়া গিলতো। কাজেও যেতো না ঠিক মতো। কবে কাজ থেকে ছাঁটাই হয়েছে রাম্থি জানতেও পারেনি। শেষে অসুখে পড়লে, রাম্থি সাধ্যমতো ডাক্তার দেখিয়েছে। বীরপাড়া হসপিটালে ভর্তিও করেছিল, কিন্তু বাঁচল না। হঠাৎ রাম্থির মায়ের কথা মনে পড়ল। ওর মা-ও মৃত্যুর আগে ঠিক এরকম দেখতে হয়েছিল কিনা জানা হয়নি। মনে হল তারও একটা এরকম ক্ষয়ে যাওয়া জীবন ছিল—যা শেষ হয়েছে অকাল মৃত্যুতে। আমি ওর চোখ দুটো দেখার চেষ্টা করলাম। এত ভেতরে ঢুকে গেছে যে বোঝা গেল না সেখানে কোন জলবিন্দু চিক্‌চিক্ করছে কি না।

শুক্লা রায়

স্কেচ : সুদত্তা বসু রায়চৌধুরী

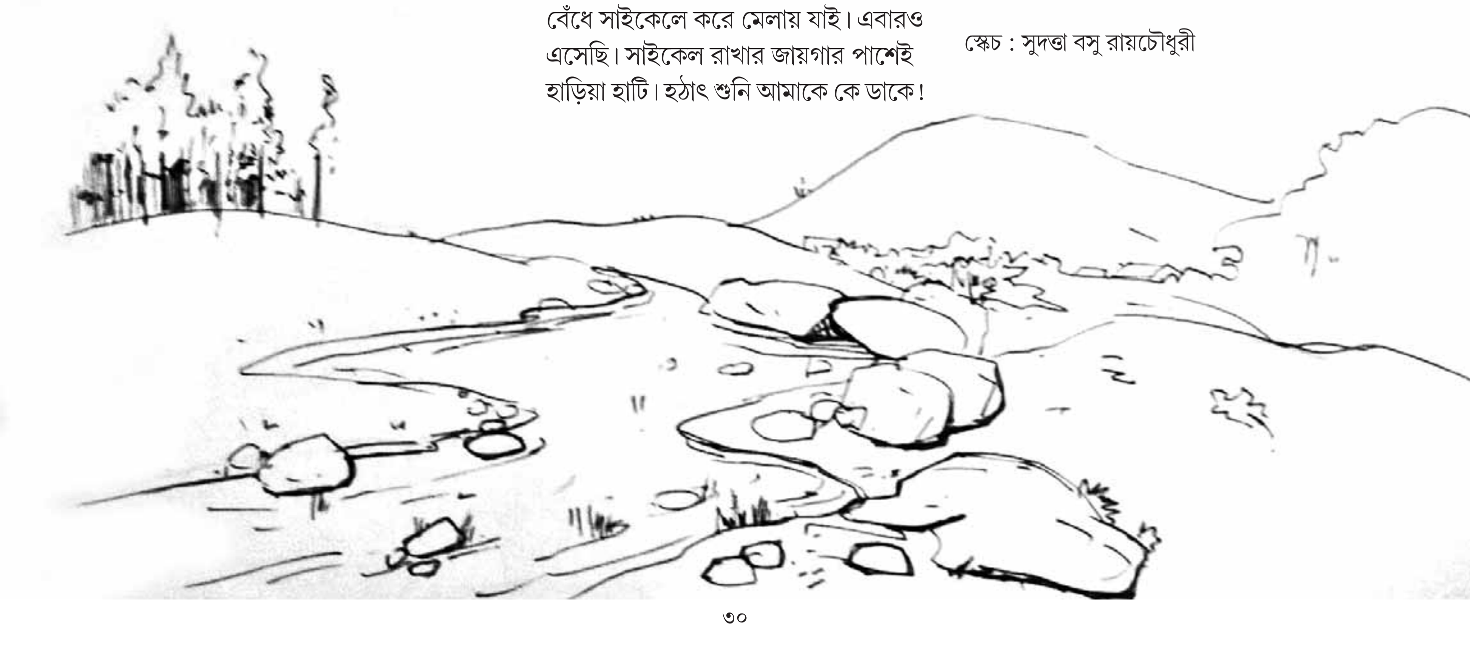

শত সমস্যাতেও টানটান চলছে জলপাইগুড়ির নাট্যচর্চা

জলপাইগুড়ির সাম্প্রতিককালের নাট্যচর্চা সত্যিই সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন এবং নানা সমস্যায় জর্জরিত। তবুও বেশ কিছু কান্ডারী তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এখনও বিভিন্ন নাট্যদলগুলিকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছেন। মনের ক্ষুধা শুধু তাঁদের নিজেদের নয়, জলপাইগুড়ির গুণরসিক দর্শক-শ্রোতারও।

যে কটি নাটকের দল তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে কিছু দল জ্বলে উঠে নিভে গেছে নানান পারিপার্শ্বিক অসুবিধের কারণে, কেউ কেউ নিবু নিবু হয়েও আজও জ্বলছে, কোনও কোনও দল বহু বছরের পুরোনো হওয়ায় বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কোনও না কোনওভাবে টিকে আছে। যারা আগামী বছরগুলিতে বিরাট প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে, কিছু আছে যারা এই দুরবস্থার দিনেও প্রায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নাটক করে। তৃতীয় শ্রেণিটিকে বুঝতে কারুরই অসুবিধে হওয়ার কথা নয় কারণ তারা অবশ্যই আর্যনাট্য সমাজ ও বান্ধব নাট্য সমাজ। এই দুই সমাজের মঞ্চস্থ বহু নাটক পর্যায়ক্রমে ভাঙাগড়া হতে হতে নাটকের ফর্ম বদলাতে বদলাতে নতুন ধারার সঙ্গে নতুন নতুন শিল্পীর আত্মনিবেদনের ফলশ্রুতিতে তাঁদের টিকে থাকা এবং উৎকর্ষ নাট্যচর্চার প্রবহমানতা বজায় রাখার ইতিহাস আজ বেশিরভাগ নাট্যমোদীরই জ্ঞাত। তা সত্ত্বেও যথেষ্ট দুঃখের সঙ্গে প্রকাশ করতে হচ্ছে যে এই দুই সমাজের প্রকৃত উৎসর্গীকৃত প্রাণ নাট্যচর্চার শিল্পীর সংখ্যা তলানিতে এসে ঠেকেছে। আর্যনাট্যসমাজে বর্তমানে তিন জনের নাম উল্লেখ করার মতো যাঁরা আজও চেষ্টা করে চলেছেন কীভাবে এই ঐতিহ্যমন্ডিত সংস্থাটিকে তার ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন না করে তাকে টিকিয়ে রাখা যায়, তাঁরা হলেন বারীন সাহা, মানস ভৌমিক ও কিংশুক বসু। এঁদের নাটকের প্রতি অদম্য আগ্রহ যদি এই বিশাল মাপের সংস্থাকে নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারে তবেই সংস্থাটি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে অন্যথায় আর্যনাট্যসমাজ, যা জলপাইগুড়িবাসীর অহংকার তা চিরতরে মুছে যাবে। তাই এই সংস্থার দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকা সকলের কাছে সমস্ত জলপাইগুড়িবাসীর পক্ষ থেকে এ নিবেদন রাখি যাতে সংস্থাটি অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

বান্ধবনাট্য সমাজের গুরুদায়িত্ব আজও সামলে চলেছেন বর্ষীয়ান শিল্পী বরুণ ভট্টাচার্য। তাঁর দীর্ঘ অভিনয় জীবনের অভিজ্ঞতা এবং জলপাইগুড়ির প্রাচীন ঐতিহ্য তথা নিজের সংস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেওয়ার সদিচ্ছাই এই শক্ত স্তম্ভের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছে বান্ধবনাট্যসমাজকে। বরুণ ভট্টাচার্যের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই। তাঁর পরিচালনায় নাটকের পাশাপাশি একঝাঁক নতুন প্রজন্মের যুবক তাঁদের রচনা ও পরিচলনা ও সাবলীল অভিনয় দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। এঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের অভিনয় দক্ষতা চোখে পড়ার মতো। যথেষ্ট সম্ভাবনাময় এ ধরনের নাট্যপ্রেমীরা যদি বান্ধবনাট্যসমাজের দাঁড় বওয়ার কাজটি শুরু করেন তাহলে বান্ধবনাট্য তো বটেই জলপাইগুড়িতেও নাট্যচর্চার পরিবেশটি তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়।

সাম্প্রতিককালে যে নাট্যদলগুলি সক্রিয় ভূমিকায় তাদের মধ্যে আর্যনাট্যসমাজ ও

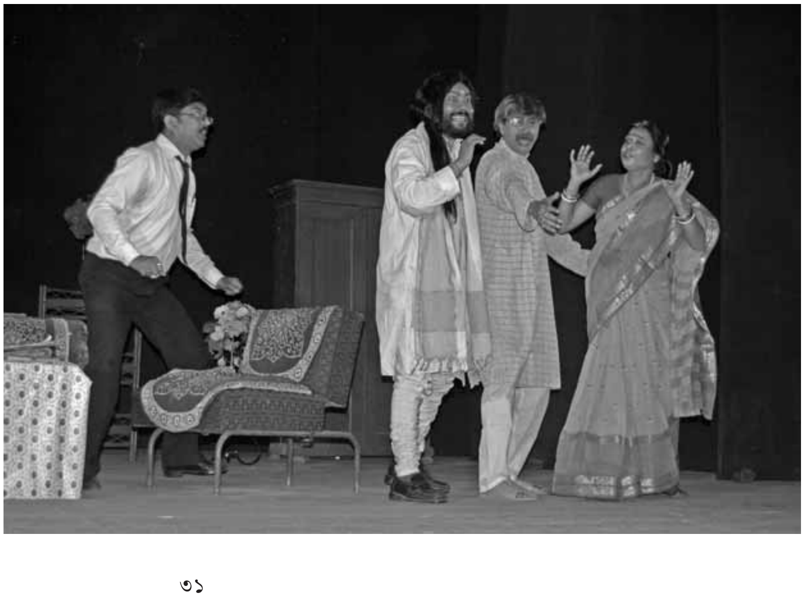

বান্ধবনাট্য সমাজ ছাড়া রয়েছে কলাকুশলী, অনুভব, চিত্তপট। রয়েছে রূপায়ন, উদীচী, উজান, দর্পন, শিলালী। অন্বেষা, অনামী থিয়েটার সেন্টার, জলপাইগুড়ি সম্বোধি, আনর্ত, সূচনা। সম্ভাবনাময় একটি নাট্যদল 'ইচ্ছেডানা' সম্পূর্ণরূপে মহিলা দ্বারা পরিচালিত ও মহিলা অভিনীত।

কলাকুশলীর নাট্যপরিচালক তমোজিৎ রায়ের পরিচালনায় যে নাটকগুলি মঞ্চস্থ হচ্ছে তা যথেষ্ট উন্নতমানের এবং তাতে গভীর ভাবনার ছাপ যা অপরকেও ভাবায়। ছোটদের নাট্যশিক্ষিত করে তোলা ও নাটকের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ানো নিয়েও ভাবছে কলাকুশলী। মূল উদ্দেশ্য নতুন প্রজন্ম তৈরি করা।

ছোটদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে চিত্তপট। শেখর মজুমদার-এর পরিচালনায় এ কাজ গত কয়েকবছর ধরেই যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে চলে আসছে। এতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশ পাচ্ছে তেমনই নাটক সম্পর্কে তাদের মনেও তৈরি হচ্ছে ভালবাসা ও আগ্রহ। একটি অত্যন্ত গঠনমূলক কাজ করছে চিত্তপট যাতে জলপাইগুড়ির নাট্যচর্চা মুখ থুবড়ে না পড়ে যায়। এইসব শিশু কিশোররাই সাবালক সাবালিকা হয়ে জলপাইগুড়ির নাট্যজগৎকে আরও শক্তিশালী করবে এ আশা করা অসমীচীন নয়।

এছাড়াও যাঁরা নাটককে ভালবেসে ছোটবড় কমবেশি কাজ করে চলেছেন ঐকান্তিক ইচ্ছে নিয়ে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডালিয়া চৌধুরী, প্রলয় ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর রায়, নারায়ণ সরকার, রীনা ভারতী, সন্দীপ ব্যানার্জী, প্রসূন দাশগুপ্ত প্রমুখ। হয়ত আরও কারুর কারুর নাম ও কাজের খবর বাদ পড়ে গেল আমার অনবধানতা বশত, এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কারণে তাঁদের কাছে আমি অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বলতে হয় জলপাইগুড়ির অনুভব নাট্যসংস্থার কর্ণধার সাধন চক্রবর্তীর কথা। নাটকের প্রতি তাঁর আত্মনিবেদন যে কতটা তা তাঁকে না জানলে বোঝা শক্ত। আধুনিক চাকচিক্য থেকে তিনি অনেক দূরে কিন্তু তাঁর আসল জৌলুষ তাঁর অভ্যন্তরের বোধ-এ, গভীরতায়। সাধন চক্রবর্তীর নিজস্ব অভিনয়রীতি যেমন দৃঢ় তেমনই তাঁর পরিচালন দক্ষতা। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ড্রামাক্লাবের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বহু বছর ধরে এক নাগাড়ে বছর দুয়েক বাদে বাদেই সাধনবাবু করে চলেছেন ওয়ার্কশপ। নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে শেখান হয় ছাত্রছাত্রীদের। সঙ্গে থাকেন মানস ভৌমিক এবং 'দৃষ্টি মাইম থিয়েটার জলপাইগুড়ি'-র কর্ণধার সব্যসাচী দত্ত। সাধনবাবুর এ উদ্যোগকে সাধুবাদ। সাধন চক্রবর্তীর মৌন কার্যকলাপ এখানেই থেমে নেই। জলপাইগুড়ি সংশোধনাগারের অভ্যন্তরে তাঁর দীর্ঘকালের পরিশ্রমের ফল প্রত্যক্ষ করা গেল ২০১৪-র জুলাই মাসের এক সন্ধ্যায় স্থানীয় সরোজেন্দ্র দেব রায়কত কলাকেন্দ্রের গণেশ রায় মঞ্চ। অন্ততঃ গোটা চল্লিশেক বন্দী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রথের রশি' মঞ্চস্থ করলেন যাতে অন্তত দশজন মহিলা। দিনের পর দিন সংশোধনাগারে যেতে যেতে এবং দীর্ঘদিন ধরে তালিম দিতে দিতে তাঁদের সঙ্গে সাধনবাবুর একটি হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কেউ কেউ সাজা শেষ করে চলে যান বাইরে, ফিরে যান মূলস্রোতে। কিন্তু তবুও সাধনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না কারুর। জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট শ্রী মধুসূদন রায় এর স্পষ্ট বক্তব্য — 'সাধনবাবু ইজ আ রিয়্যাল হিরো'। তাঁর ক্লান্তিহীন নিরলস একাগ্রতা যে কত গভীর এবং কতটা শিক্ষনীয় এটি তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। জলপাইগুড়ির গর্ব।

সাধনবাবুর মতো মানুষের টাকা নেই কড়ি নেই। কিন্তু আছে মেধা বুদ্ধি পরিশ্রম করবার ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তি এবং সর্বোপরি নাট্যচর্চার প্রতি অগাধ মমত্ব। কিন্তু হলে কী হবে? জলপাইগুড়িতে নাট্যচর্চা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা এক সমস্যাসঙ্কুল বন্ধুর পথ। একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে যা আর্থিক প্রয়োজন তা মেটানো যথেষ্ট কঠিন হয়ে দাঁড়ায় নাট্যদলগুলির। আরও কতরকম যে সমস্যা রয়েছে —

সমস্যা ১ ঃ

বড় বড় শহরগুলিতে দেখা যায় বড় বড় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি আর্থিক সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে তাদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। কিন্তু জলপাইগুড়িতে তার একেবারেই অভাব। টিকিট বিক্রি করতে হয় নিজস্ব ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তাতেও মানুষের বিরূপভাজন হতে হয় বেশিরভাগ সময়। তবুও লাজলজ্জা ছেড়ে তা করতে হয় লাইট সাউন্ড আর হলভাড়াটুকু জোগাড় করবার জন্যে। অথচ জলপাইগুড়ির মানুষ কিন্তু সংস্কৃতিমনস্ক।

সমস্যা ২ ঃ

আগে পড়াশুনোর পাশাপাশি ছোটদেরও পাওয়া যেত প্রচুর। কিন্তু এখন নাটক করবার সময় নেই তাদের। সন্ধে হলেই মাস্টারমশাইদের কাছে দৌড়নো, সকাল হলেই স্কুল, বাকি সময়টুকু টিভি দেখেই কেটে যায়। উৎসাহের অভাব অভিভাবকদের মধ্যেও। সবকিছুই বড্ড যান্ত্রিক। হয়ত উপায়ও নেই। চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতার হার এতটাই বেড়েছে এবং একটি মোটামুটি চাকরি জোগাড় করতে হলেই যতটা লেখাপড়া জরুরী ততটা করতেই হিমসিম অবস্থা। আজকাল বেঁচে থাকার মাপকাঠি টাকার মূল্যে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের লাইফস্টাইল মতো একটি চাকরি করার জন্য কে না ছুটছে। ফলে নাটক করে নষ্ট করার মতো সময় তাদের কাছে নেই। অর্থাৎ এর জন্যে দায়ী আমাদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি।

সমস্যা ৩ ঃ

একাধারে নাট্যকর্মী এবং প্রাইভেট টিউটর। তার গল্পটা আবার একটু অন্যরকম। যে সময়টায় সে রিহার্সাল দেবে সে সময়টায় তার কিছু উপার্জন হবে, কোনটা জরুরী? অবশ্যই দ্বিতীয়টি। ফলে সংস্থা থেকে যদি এ ধরনের নাট্যকর্মীদের হাতে কিছু অর্থ তুলে দেওয়া যেত তাহলে অনেককে কাছে পাওয়া যেত হয়তো বা। এর কারণটিও ২নং-এর মতোই। বাজারমূল্য বৃদ্ধি এবং তার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে খরচ সামলাতে না পারার অসুবিধে।

সমস্যা ৪ ঃ

বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীগুলি কমবেশি বেশিরভাগই পুরস্কার মুখাপেক্ষী। নিজ প্রদেশের অন্য শহরের অথবা ভিন প্রদেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণ করে পুরস্কার পেয়ে গেলে সেই দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব দলটিকে কিছুটা হলেও শ্লথ করে তোলে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ তবে তার আগে প্রয়োজন নাটকের খুঁটিনাটি ত্রুটিবিচ্যুতিকে শেকড়সহ উপড়ে ফেলা। সমস্যা হল পরিপূর্ণমাত্রায় ডেডিকেটেড নাট্যশিল্পীর আজকাল বড় অভাব। হয়ত পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সে ব্যাপারে অনুকূলও নয়। রিহার্সালের প্রতি নজর রাখলে বোঝা যায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত এবং

সব কাজ ফেলে অথবা সেরে প্রতিদিন শুধু রিহার্সালের জন্যেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেকের পক্ষেই প্রায় অসম্ভব। ফলে পূর্ণ নাটকটির নিয়মিত মহড়া দেওয়া সম্ভবই হয় না মঞ্চে অভিনয়ের দু-তিন দিন আগে ছাড়া। কিন্তু একটি নাটককে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও নিখুঁত করতে হলে চাই প্রত্যেকটি চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং সেই অনুযায়ী সেই চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলা। এর জন্যে প্রয়োজন নিয়মিত মহড়া, নিজের চরিত্রটিকে নিয়ে চিন্তা করা এবং সেই সঙ্গে নির্দেশকের সঙ্গে বসে চরিত্রটিকে নিয়ে আলোচনা এবং নির্দেশকের প্রয়োজন অনুযায়ী সবটা দিতে পারার চেষ্টা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মোটামুটি ভাবে কয়েকটা দিন রিহার্সাল দিয়ে নিজের অংশটি বুঝে নিয়ে 'মঞ্চে উতরে দেব' এই মনোভাব নিয়ে বিষয়টিকে খেলার ছলে নিয়ে নেওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। এগুলি বাস্তবিকই নাট্যদল তথা নির্দেশককে দারুণভাবে বিড়ম্বনায় ফেলে।

সমস্যা ৫ ঃ

টিভির বিভিন্ন চ্যানেল মানুষের মনের ওপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে যে একদল দর্শক তো এখানেই বিয়োগের খাতায়। কেন আবার কষ্ট করে নাটক দেখতে যাওয়া, তার চাইতে অনেক বেশি ভাল লাগার জায়গা তৈরি হয়েছে সেখানে যেখানে ঘরে বসে বসেই একাত্ম হয়ে যাওয়া অন্য একটি পরিবারের সঙ্গে, তাদের আনন্দ বেদনাই যেন নিজের আনন্দ বেদনা হয়ে ওঠে দিনের পর দিন। হ্যাঁ সেইসব ধারাবাহিকগুলির কথা বলছি যা ক্রমশই গ্রাস করে নিচ্ছে বহু দর্শক, শুধু নাটক থেকেই নয় জলপাইগুড়ি শহরের সিনেমাহলগুলি থেকেও।

সমস্যা ৬ ঃ

নাটকটা একটু শিখতে না শিখতেই, বুঝতে না বুঝতেই অথবা না শিখে না বুঝেই যুব সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ ঝুঁকে পড়ছে টেলিফিল্ম নির্মাণ প্রকল্পে। সে ফিল্মটির গুণাগুণ বিচার্য নয়, যেমনই হোক যেন তৈরি করতে হবেই। এ এক অদ্ভুত জোয়ার। অন্তত সাতষট্টিটি ফিল্ম তৈরি হয়েছে রাজবংশী ভাষায় তার কটারই বা খবর আমাদের জানা! এক্ষেত্রেও বহু ছোট ছেলেমেয়ের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অভিনয় নিয়ে চর্চা করার বা তার মান উন্নয়নের কোনও সম্ভাবনাই থাকছে না।

সমস্যা ৭ ঃ

জলপাইগুড়িতে নাটক শুধু নয়, অন্যান্য অনুষ্ঠানেও দর্শক পাওয়া একটি গুরুতর সমস্যা। এর একটি বড় কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা। অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত একটু বেশি হলেই দর্শক-শ্রোতাকে আর বসিয়ে রাখা যায় না তাদের বাড়ি ফিরতে না পারার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে। সাড়ে নটা বাজলেই আর রিক্সা পাবেন না, হয়ত তাঁকে যেতে হবে আর্ট কমপ্লেক্স থেকে পান্তাপাড়া, অথবা রবীন্দ্রভবন থেকে কলেজপাড়া। অথবা... অথবা...।

ফলে দেখা যাচ্ছে, জলপাইগুড়িতে নাটকের দুরবস্থার পেছনে শুধুমাত্র একটি কোনও বিশেষ কারণ নয়। অনেকগুলি সমস্যার মিলিত আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে জলপাইগুড়ির নাট্যচর্চা। এ সমস্যাগুলির সমাধান সহজ নয়। এ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি থেকে নাটকের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার প্রয়াসও কিছু কম কথা নয়। তবুও তা চালিয়ে যেতেই হবে। এবং বিশ্বাস, যাঁরা নাটককে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসেন তাঁরা তা চালিয়ে যাবেনও।

শ্বেতা সরখেল

ছবি : শঙ্কর ভট্টাচার্য

পাঠকের কলমে

(আপনার ডুয়ার্স ভাবনাকে সরাসরি পোস্ট বা মেল করুন। পাঠকের মতামত তাদের নিজস্ব, পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ তার দায়িত্ব বহন করে না।)

অশনি সংকেত

বর্ধমানের বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর থেকে রাজ্য জুড়ে একটার পর একটা জঙ্গি ডেরা, বেআইনি মাদ্রাসা আবিষ্কার, তার সূত্র ধরে প্রতিবেশী দেশের মৌলবাদী সংগঠনগুলির সন্দেহজনক কার্যকলাপ, উত্তরবঙ্গের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে মৌলবাদীদের আঁতাত এবং সেই অশুভ চুক্তিতে ভিনদেশী অর্থের জোগান ও প্রত্যক্ষ মদত ইত্যাদি সবকিছুই যেন একসঙ্গে উঠে এল একের পর এক। যেন লাইন দিয়ে সব রেডি করাই ছিল। অনেকটা লংকাবাজির মতো, একটা পলতেয় শুধু আগুন দিলেই হল, একের পর এক ফাটতে থাকে অনবরত। এসব খবরে সাধারণ নাগরিকদের স্বাভাবিকভাবেই চোখ কপালে উঠেছে, রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে ডুয়ার্সের মানুষ। বরাবরই শান্তির বাতাবরণ যে ডুয়ার্সে, সেখানে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে জঙ্গিরা আর পাঁচ জনের মতোই, ভাবলেই শিউরে উঠছে সবাই।

ঘটনার রোজকার অগ্রগতির খবর পড়তে পড়তে কিছু 'অবান্তর' প্রশ্ন কিন্তু মাথার মধ্যে ঘুরতেই থাকে, কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারি না। প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, বিস্ফোরণের খবর পেতেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল, অথচ এতদিন তাদের 'ইনফর্মেশন নেটওয়ার্কে' কিচ্ছু ধরা পড়েনি? রাজ্য গোয়েন্দাবাহিনী না হয় ধরে নিলাম সবসময়ই কিঞ্চিৎ অকর্মণ্যতার পরিচয় দেয় কিংবা এতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু প্রচুর অর্থে লালিত অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি সুসজ্জিত ও তৎপর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনীর কাছে এখানকার এইসব কার্যকলাপের কোনও খবর এর আগে ছিল না, এটা মেনে নিতে কষ্ট হয় না? বিশেষ করে যখন সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অনুপ্রবেশের ঘটনা গত কয়েক দশকের পুরনো এবং সংবাদমাধ্যমে বহুল প্রচারিত।

এরপর 'হঠাৎ' আবিষ্কার হওয়া এই জঙ্গি কার্যকলাপের নেটওয়ার্ক খুঁজে বার করতে গোয়েন্দারা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তখন কিন্তু আবার সেই 'অর্থহীন' সন্দেহ উঁকি মারে। এত তৎপরতা এতদিন অনুপস্থিত ছিল কেন? তবে কি গোয়েন্দারা এতদিন গ্যালারিতে বসে দেখছিলেন কতদিনে এর বাড়বাড়ন্ত হবে?

জনৈক উদীয়মান রাজনৈতিক নেতা বন্ধুকে এ প্রশ্ন করাতে তিনি সহজ উত্তর দিয়েছিলেন, এতদিনে কেন্দ্রে যে সরকার ছিল তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং দুর্নীতিগ্রস্থ, দেশের নিরাপত্তা ইত্যাদি নিয়ে তাদের ভাববার সময় বা সদিচ্ছা কোনওটাই ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই গত পাঁচটা বছর এরাজ্যের নেপাল ও বাংলাদেশ সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে আদৌ কোনও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আর এরাজ্যের সরকার? সে তো প্রথম থেকেই সংখ্যালঘু তোষণে এতটাই মগ্ন যে তাদের কর্মকাণ্ডে ক্রমাগত প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কিচ্ছু করেনি। তারই পরিণামে রাজ্য জুড়ে আজ এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

সেই নেতা তথা রাজনীতি সচেতন মানুষকে যদি আজ একটা 'অর্বাচীন' প্রশ্ন করি — আচ্ছা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর এই অকস্মাৎ তৎপরতা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তির সুযোগ বুঝে সুচতুর চাল নয় তো? এই রাজ্যে এই মুহূর্তে কমিউনিষ্ট বা কংগ্রেস এই দুই 'ধর্মনিরপেক্ষ' মুখ-ই নিস্ক্রিয়, প্রায় সাইনবোর্ড দলে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনীর দাপটের খবর যতই সংবাদ মাধ্যমগুলি প্রচার করবে ততই ভয়ে-লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়বে এ রাজ্যের সংখ্যালঘুরা। আর যতই তাদের পাশে দাঁড়াবার কথা বলবে এরাজ্যের শাসক দল ততই উল্টো শিবিরের ভোটব্যাংক স্ফীত ও দৃঢ় হতে থাকবে। সাম্প্রদায়িক সেন্টিমেন্টের রাজনৈতিক মুনাফার এরকম অনুকূল পরিস্থিতি চট করে তো আর আসে না সচরাচর।

এ রাজ্যের ভোটব্যাংককে সাম্প্রদায়িক 'মেরুকরণ'-এর সংকেত ইতিমধ্যেই গত সাধারণ নির্বাচনে পাওয়া গেছে। ডুয়ার্সের প্রান্তিক জেলাগুলিতে তা অত্যন্ত প্রকট। আগামী নির্বাচনের কথা ভেবে এই মেরুকরণকে ত্বরান্বিত করতে চাইছেন ভবিষ্যতের বঙ্গেশ্বররা—এর অশুভ পরিণাম নিয়ে ভাবতে তাদের বয়েই গেছে। সীমান্তবর্তী জেলার বাসিন্দা হয়ে সবচাইতে বেশি ভুক্তভোগী যে হব আমরাই সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভোটের মুনাফা তুলতে মৌলবাদীদেরকে সাধারণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে গুলিয়ে এক করে দিতে পিছপা হবে না। রাজনীতির প্রতিনিধিরা। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত শিক্ষিত নাগরিককে তাই বোধহয় সচেতন হতে হবে আজই, না হলে যে রক্ষে নেই। মৌলবাদী নাশকতা কিংবা ধর্মভিত্তিক ভোটব্যাংক দুইই যে আমাদের কাছে অশনি সংকেত।

নৃপেন্দ্রনাথ রায়, আলিপুরদুয়ার

শিলিগুড়িতে মিটার ট্যাক্সি এখনও অধরা

মাস দুয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেছিলেন এই নো রিফিউজাল ট্যাক্সির। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় এই মিটার ট্যাক্সির ব্যাপারে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেওয়ার পর অনেকের হাতে অফার লেটার তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাদের সিংহভাগই এখনও গাড়ি নেয়নি বা গাড়ি বের করেনি। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত শিলিগুড়ি, রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি ও মালবাজার মহকুমায় এই মিটার ট্যাক্সি চলার কথা। প্রথম ১-৭ কিমির জন্য ন্যূনতম ভাড়া ২৫ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি ২০০ মিটারে ২.৪০ টাকা। মালপত্র থাকলে তার ভাড়া আলাদা। মিটার ট্যাক্সি চালু করার এই সিদ্ধান্তে সবচাইতে বেশি উপকৃত হতেন পর্যটকরা। মিটার ট্যাক্সি সহজলভ্য হলে অন্তত মালবাজার বা ময়নাগুড়ি পর্যন্ত ন্যায্য দামে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম খরচায় ডুয়ার্সের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়া যেত। কিন্তু তাদের সে আশায় জল ঢেলেছে ঘোষিত মিটার ট্যাক্সির আবির্ভাব না ঘটায়। কিন্তু অনেকেরই মতে শিলিগুড়িতে এমনিতে চওড়া রাস্তা ঘাটের অভাব, তার ওপর রিক্সা ও অটোর সঙ্গে মিটার ট্যাক্সি যুক্ত হয়ে যানজট বাড়বে

বই কমবে না। অটোওয়ালাদের অভিমত, ব্যাংক ঋণ নিয়ে ট্যাক্সি নামিয়ে রোজ যে সওয়ারি পাওয়ার সম্ভাবনা আর যে রেট ধার্য করা হয়েছে তাতে ব্যাংকের মাসিক কিস্তি শোধ করাই কঠিন, রোজগার তো দূরের কথা। আবার শিলিগুড়ির কিছু রাজনীতি সচেতন মানুষ এই ট্যাক্সি চালু না হওয়ার পেছনে স্থানীয় কিছু নেতাদের কায়েমী স্বার্থের গন্ধ পাচ্ছেন। তাঁদের মতে ট্যাক্সি চালু হলে এবং তা জনপ্রিয় হলে শহরে অটো বা রিক্সার জনপ্রিয়তা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। আর তখন টান পড়বে তাদের প্রাপ্য হপ্তায়।

সে যাই হোক না কেন, একটি ব্যাপারে সবার অভিমত এক। তা হল, শিলিগুড়িতে রোজ সমাগম ঘটে আশেপাশের জেলা ও রাজ্য থেকে আসা ব্যবসায়ী এবং সেই সঙ্গে চিকিৎস্যার জন্য আসা রুগি ও আত্মীয় পরিজনদের। শতাব্দী এক্সপ্রেস চালু হওয়ায় বেশি রাতে এবং খুব ভোরে লোক চলাচলের পরিমাণও বেড়ে গেছে। বিমানবন্দরেও তেমনই বিমানের সংখ্যা বাড়ছে, চালু হয়ে গেছে সান্ধ্যকালীন পরিষেবা। সবার ওপরে আছে মরসুমী পর্যটকের ভিড়। একই সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে শহরের রাস্তায় অস্বাভাবিক যানজটের কথাও। এই মুহূর্তে সবার সুরাহা হত, যদি বেশ কিছু সিএনজি অটোরিক্সা মিটার লাগিয়ে চালু করা যেত। এতদিনের পুরনো অটোগুলিকেও সেক্ষেত্রে সিএনজিতে পরিবর্তন করে নেওয়া যায়। এমনিতেই কালের নিয়ম মেনেই পায়ে টানা সাইকেল রিক্সা খুব শীগগিরিই অবলুপ্তির পথে চলে যাবে, ব্যাটারিচালিত 'টো টো'-র আবির্ভাব তার ইঙ্গিত। তবে মিটার অটো চালু হলে এবং তা সহজলভ্য হলে শিলিগুড়িতে রিক্সাওয়ালাদের অকথ্য খামখেয়ালিপনা, যানজট সবই যথেষ্ট হ্রাস পেত নিঃসন্দেহে।

সৌমেন ঘোষ, শিলিগুড়ি

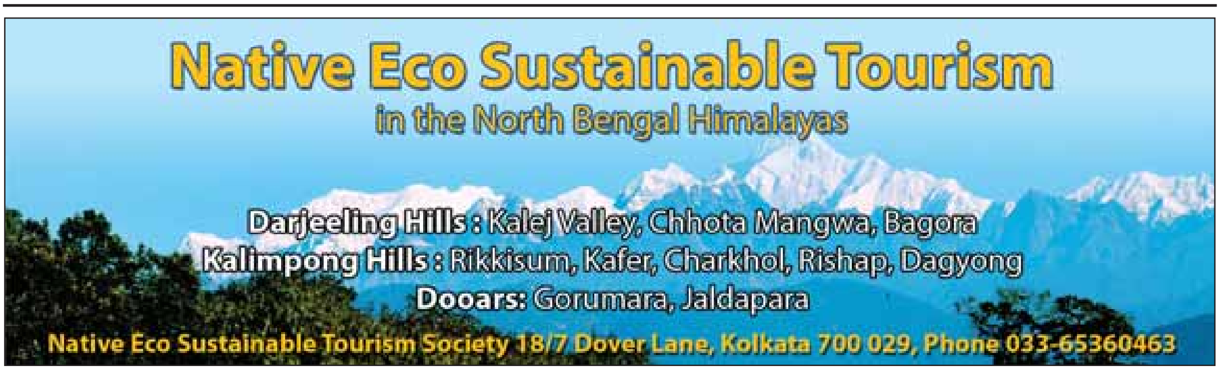

EKHON DUARS, Vol-1, Issue-6, WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

তোমার জাদুতে
আজ উঠল মেতে
এই জীবনের ছন্দ

এলিট মানে
ভালো জুতো ব্যস

Elite®
FOOTWEAR
পায়ে পায়ে আনন্দ

VISTAAR

Show Room : Lindsay Street, Hatibagan, Behala, Serampore (Hoogly), Chinsura (Hoogly), Bardhaman (2 B.C. Road, Near Karjon Gate), Durgapur (Benachiti, Kizer More), Barakar (Dishergarh Road), Coochbehar, Alipurduar, Bansdroni, Kudghat, Garia, Budge Budge, Ghatakpukur, Thakurnagar (24 Pgs N.), Saharar Hat Falta, Kakdwip, Canning, Haldia (Manjushree), Jhargram, Andul (Howrah), Bali-Badamtala (Howrah), Konnagar, Rishra, Kamarkundu, Arambag, Nagerbazar, Sodepur, Madhyamgram, Basirhat (Astana Road), Krishnanagar, Aurangabad, Baharampur (Khagra), Raghunathganj, Malda (Rabindra Avenue), Kaliachak (Malda), Buniadpur (South Dinajpur), Gangarampur, Balurghat, Raiganj, Islampur, Siliguri (Bidhan Market), Dhupguri, Falakata, Maynaguri, Dinhata, Mathabhanga, Haldibari, Dhubri **and in other states**. **Contact for New Show Room : 98314 51316 / 98313 34567**

Available in other Company approved Towns : North 24 Pgs. - Janata Shoe (Baduria), Raja Padukalaya (Shyamnagar), Minati Shoe (Bangaon), **South 24 Pgs.** - Calcutta Shoe House (Gosaba), Pather Sathi (Siddeshwar), Laltu Shoe (Kulgachhia), **East Midnapur** - Maity Shoe (Mathchandipur), **West Midnapur** - Kaushik Traders (Ghatal), Fashion Shoe (Gorbeta), **Murshidabad** - Riju Shoe (Domkal), **Durgapur** Bidhannagar - New Nibedita Shoe Stores, **Bankura** - Padukalaya, Jyotsnalok (Bishnupur), **Purulia** - Rajesh Shoe.

Contact for Dealership : 033-2215 6356 (11 A.M. to 6 P.M.)

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.